অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

ত্রয়োদশ সংস্করণ, মাঘ, ১৩৯১

—ঃ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—
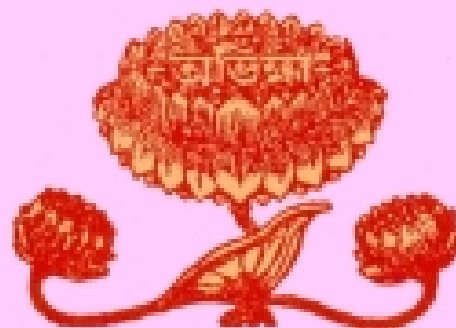
—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০

সপ্তম সংস্করণের নিবেদন

দেশে আজ অকালবীর্য্যক্ষয়ের প্রচ্ছন্ন পাপস্রোত কি খরবেগেই না প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। সমগ্র দেশের ও জাতির যে মরণপথযাত্রা, তাহা বুঝিবার লোকের সংখ্যা অতি অল্প, তাহা বুঝাইবার লোকের সংখ্যা তাহা অপেক্ষাও অল্পতর। কেহ কেহ বা বুঝিয়াও বুঝে না এবং জাতির নিয়ত-ধ্বংস-পরায়ণ এই নিদারুণ অনিষ্টের প্রতি একান্তই উদাসীন।

এই অকল্যাণ ও ধ্বংসের করাল গ্রাস হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণি, অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব, তাঁহার জীবনের অতি তরুণ কৈশোরেই কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন। সেই দিন ভারতের পরাধীনতা-বেদনায় কাতর কত কত স্বদেশপ্রেমিক শক্তির মন্ত্রে দীক্ষা নিয়া নব-ভারতকে গড়িয়া তুলিবার সাধনায় দিকে দিকে মাথা তুলিবার প্রয়াস শুরু করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দের অমোঘবীর্য্য লেখনী সেই সময় হইতেই বজ্রের মতন বাণী প্রসব করিয়া তন্দ্রাতুরের তন্দ্রা, আলস্যোপহতের অলসতা ও ভীতিগ্রস্তের ভয় নিবারণ করিতেছিল। পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া নয়, পুস্তক প্রকাশ করিয়া নয়, মাত্র ডাক-যোগে পত্র প্রেরণ করিয়া করিয়া তিনি সেই সময় হইতে ভারতের কত শ্রেষ্ঠ সন্তানকে প্রেরণা ও অভয় যোগাইতেছিলেন। আজ দেশের অতি প্রখ্যাত অনেক ব্যক্তিকেই প্রকাশ্য জনসভাতেও সেই ঋষিঋণ গৌরবে স্বীকার করিতে দেখা যায়।

অসংযমের অকল্যাণকে একটি একটি করিয়া শত শত সহস্র সহস্র

জীবনের মধ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবার দুশ্চর তপস্যায় আত্মদানকারী শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব নিজ দিব্য-জীবনের পবিত্র সংস্পর্শ জনে জনে দান করিয়া সকলের অগোচরে এবং ভাষণ-মঞ্চের বাহিরে থাকিয়াই এক বিশাল, বিপুল, বিরাট্ ও মহান্ ভারতবর্ষ সৃষ্টি করিতেছিলেন। শ্রমে তাঁহার ক্লান্তি ছিল না, চেষ্টায় তাঁহার বিরাম ছিল না, কামনায় ছিল না বিশ্রামের কোনও স্থান, আশায় ছিল না পরাজয়ের কোনও প্রবেশাধিকার। একটি একটি করিয়া ছেলেকে ধরিয়াছেন, আর নিবিড় নিষ্ঠায় তাহাকে ঘিরিয়া তাঁহার পত্রের সাহিত্য সহস্র ধারায় নির্ঝরিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্য আমাদের, এই অপূর্ব্ব পত্র-সাহিত্য প্রায়শঃ রক্ষিত হয় নাই। তাহা রক্ষা করিবার দিকে কাহারও লক্ষ্যই ছিল না। পত্রকার নিজে একটিবার ভাবেনও নাই। তিনি সাহিত্য রচিতে চাহিয়াছেন মানুষের জীবনের গতি-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া এবং সেই সাহিত্য সত্য সত্য রচিতও হইয়াছে। কেমন করিয়া দলে দলে যুবকেরা অক্লেশে ভারতমাতার চরণশৃঙ্খল কাটিবার জন্য কত ভাবে প্রাণ দিল, আর সেই সকল মরণজয়ীর জীবনে কেমন করিয়া অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের অমোঘ আশীর্ব্বাদ ও অলোপ্য স্বাক্ষর সকলের দৃষ্টির অগোচরে কাজ করিয়া গেল, তাহার ইতিহাস কখনও লিখা সম্ভব নহে।

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব কিঞ্চিদূন অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া দেশব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারে যত্নবান্ রহিয়াছেন। সুকুমারমতি কিশোরী ও সহজভাবপ্রবণ যুবক-সমাজের মধ্যে তিনি অবিরাম অবিশ্রাম ব্রহ্মচর্য্যের বাণী প্রচার করিয়াছেন; জীবের প্রতি, জগতের প্রতি,

নিবেদন

দেশের প্রতি, জাতির প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্যের দায় তাহাদিগকে নিরন্তর স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, পবিত্র জীবনের প্রতি তাহাদের মনের প্রবল অনুরাগ সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকের পরিস্থিতি পবিত্র জীবন-যাপনের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য জনমত সৃজনে তিনি বিপুল আন্দোলন পরিচালন করিয়াছেন; সংযম-সুন্দর, ত্যাগ-সুরভি, লোককল্যাণব্রত আদর্শ জীবনের প্রতি তিনি সকলের শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন; কর্ম্মকুণ্ঠ, আলস্যশীল, কুচিন্তা-পরায়ণ যুবকদিগকে সমাজ-কল্যাণে উৎসাহিত করিয়া তাহাদের নৈতিক অধোগতি অবরুদ্ধ করিয়া নব নব কল্যাণ-পথে তাহাদের অদম্য উদ্যমকে প্রেরণ করতঃ তাহাদের চারিত্রিক পরিবর্ত্তন-সাধনে তিনি যত্নপর হইয়াছেন। একটি দিন নয়, একটি মাস নয়, একটি বৎসর নয়, দ্বাদশ বৎসরে নাকি একটি যুগ হয়,—যুগ যুগ ধরিয়া তিনি অক্লান্ত উদ্যমে ইহাই করিয়া আসিয়াছেন। যাহার অন্তরের ব্যথা বুঝিবার কেহ নাই, ইনি তাহার ব্যথা-বেদনা ঘুচাইবার পবিত্র দায় নিজে যাচিয়া স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরা বোঝে না, তাহাদের ইনি আত্মনাশের মারাত্মক ব্যসন হইতে নিজে যাচিয়া গিয়া রক্ষা করিয়াছেন; যাহাদের দুর্ব্বল মন বারংবার তাহাদিগকে লালসার অগ্নিকুণ্ডেই নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহাদের তিনি বুকে করিয়া সেই অনলের লেলিহান রসনার স্পর্শ হইতে টানিয়া তুলিয়া আনিয়াছেন। ইহাই হইয়াছে তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের সমগ্র প্রচেষ্টার প্রকট আলেখ্য। ভাষণমঞ্চে তিনি দাঁড়াইয়াছেন তাঁহার কর্ম্মজীবনের শেষ দিক্ দিয়া, কিন্তু তখনও সমাজের অন্য সকল সমস্যার চাইতে অকালবীর্য্যক্ষয়পরায়ণ আত্মঘাতী

যুবকদের জীবনের সমস্যাই সর্ব্বপ্রধান স্থান পাইয়াছে। দীর্ঘকাল যাবৎ নানা ভাবে সেই জাতিরক্ষা-মূলক, জাতিপোষক, জাতিধারক উদ্দেশ্য-সমূহের পরিপূরণকল্পে নানা ভাবে যে চেষ্টা তিনি করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে সুবিপুল সফলতাও অর্জ্জিত হইয়াছে। শ্রীশ্রী-বাবামণির প্রাণপাত চেষ্টার ফলে আত্মবিশ্বাসহীন অসংখ্য দুর্নীত যুবকের পাপপঙ্কিল মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার পবিত্র বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে এবং জাতি ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের যুবক-সমাজ আত্ম-গঠনোপযোগী পরমোৎকৃষ্ট উপদেশ লাভ করিয়া জীবনকে পাপমুক্ত ও বিশুদ্ধ করিতেছে। ইহারই অতি স্বাভাবিক পরিণতি-হিসাবে আজ ভারতের অনেক প্রদেশে কুমারী মেয়েদের মনেও নৈতিক পবিত্রতার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুশীলনের দিকে তীব্র আকর্ষণ সৃষ্ট হইয়াছে এবং সেই আকর্ষণকে অপরাজেয় করিবার জন্যও শ্রীশ্রীবাবামণি, অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব মহারাজ দীর্ঘকাল ধরিয়া সমাজ-মঙ্গল-অনুষ্ঠান-সমূহ করিয়া আসিতেছেন।

এতদুদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীবাবামণি কি যে সুকঠোর পরিশ্রম তাঁহার জীবন ভরিয়া করিয়াছেন, তাহা বর্ণনার অতীত বলিয়া মনে করি। সমাজের সেবা করিতে ইতঃপূর্ব্বে প্রত্যেক সমাজকর্ম্মী জনসমাজ হইতে আর্থিক সহায়তা সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন এবং নিজেদের আদর্শ-সেবার অকপটতার সহিত যেখানে প্রচুর অর্থবল সংগ্রহের প্রয়াস সফল হইয়াছে, জনসেবা সেখানেই সম্ভব হইয়াছে। শ্রীশ্রীঅখণ্ডমণ্ডলেশ্বর সেই পথ পরিহার করিয়াই চলিয়াছেন। ভিক্ষা-প্রার্থনায় সময়ের অপচয় না করিয়া, অপরের অর্জ্জিত অর্থ চাঁদারূপে সংগ্রহের প্রয়াসে না যাইয়া তিনি অপরাজেয় সাহস সহকারে নিজের শক্তির উপরেই

নির্ভর করিয়াছেন এবং একটার পর একটা করিয়া বিপুল প্রয়াসকে সাফল্য প্রদান করিয়াছেন। ভিক্ষা ব্যতীত স্বাবলম্বনের শক্তিতে তিনি আশ্রমের পর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বনের উপরে নির্ভর করিয়া জীবসেবার প্রয়াস পাইয়াছেন। মানভূম জেলায় একবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, জেলার সকল সমাজ-কর্ম্মীরা যেই সময়ে ইংরাজের কারাগারে বন্দী, আর অদ্ভুত-পরাক্রম শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ সেই সময়ে গ্রামের পর গ্রামে প্রচার-কার্য্য করিয়া সম্পন্ন-লোকদের দিয়া বিপন্নকে কাজ দেওয়াইয়া, ছোট বড় সকল লোককে নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী কিছু না কিছু কাজ করাইয়া লইয়া অন্নহীনকে অন্নদানের বিরাট্ অভিযান পরিচালন করেন। পুপুন্কী অযাচক আশ্রমের মাটিতেও দৈনিক প্রায় একশত নরনারীর কাজের সংস্থান করিয়া এই আন্দোলনে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহারই ফলে, দেখিতে না দেখিতে দুইমাস সময়-মধ্যে কোনও প্রকার সরকারী সাহায্য ব্যতীত দুর্ভিক্ষের করাল মুখব্যাদান বন্ধ হইয়া গেল। ইহা কল্পনার রঙীন স্বপ্ন নহে,—ইহা ইতিহাস। নিজ আশ্রমগুলি হইতে শত প্রকারে জনসমাজের সেবা করিয়া ত' তিনি লোকের কাছ হইতে চাঁদার প্রতীক্ষা রাখেনই নাই, বাহিরের বিশ্বে বিপুল ব্যয়সাধ্য জনসেবা করিতে গিয়াও অভিক্ষার আদর্শকে সমুজ্জ্বল রাখিয়াছেন। ইহা ভারতীয় কর্ম্মযোগ-সাধনার ইতিবৃত্তে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার, এক অদ্ভুত ঘটনা, এক অনুপম দৃষ্টান্ত। ইনিই বর্ত্তমান-যুগে স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত লোকহিতব্রত প্রতিষ্ঠানের প্রথম পরিচিন্তক, স্থাপয়িতা ও পথ-প্রদর্শক। "অভিক্ষা" নামক একটি শব্দ যে ভারতীয় ভাষার অভিধানে স্থান পাইল, তাহার স্রষ্টাও ইনি, কারণও ইঁহার অদ্ভুত জীবন।

আজ ভারতের প্রদেশে প্রদেশে কত বনমহোৎসব হইতেছে। বৃক্ষ-সৃষ্টির আন্দোলনকে কত প্রকারে জনসমাজে আদৃত করিবার জন্য কত কত অর্থক্ষয় হইতেছে। কিন্তু যখন বর্ত্তমান ভারতীয় নেতাদের কেহই এই বিষয়টা নিয়া চিন্তা করিবারও অবকাশ পান নাই, সেই সময় এক সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ প্রতি বৎসর নিজ আশ্রম-সমূহে ফল-বৃক্ষের চারা তৈরী করিয়া অবিরাম বিতরণ করিয়াছেন। একটি নহে, দুইটি নহে, কোনও কোনও বৎসর বিতরিত চারার সংখ্যা এক লক্ষকেও অতিক্রম করিয়াছে। একটি দুইটি চারা বিতরণ করিলে বলা চলিত যে. ইহা একটা ব্যক্তিগত রুচি বা ইংরাজীতে যাহাকে বলা হয় "হবি"। কিন্তু লক্ষ লক্ষ চারা যে বিতরিত হইয়াছিল, তাহাই প্রমাণিত করিয়া রাখিয়াছে যে, ইহা জাতির কল্যাণের জন্য একটা সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা-সমন্বিত আন্দোলন। একটা মাত্র বা দুইটা মাত্র বৎসর যদি এই কাজটা চালান হইত, তাহা হইলেও বলা চলিত যে, ইহা একটা ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার মাত্র। কিন্তু বাংলা ১৩৩৪ (ইং ১৯২৭) হইতে অবিরাম অবিশ্রাম এই একই কাজ চালু থাকিয়া প্রমাণিত করিতেছে যে, আজ দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যাহার প্রয়োজন মাত্র অনুভব করিয়াছেন বলিয়া দেখা যাইতেছে, ভারতের ঋষি-জীবনের এক সর্ব্বপ্রধান প্রতিনিধি বাইশ তেইশ বৎসর পূর্ব্বেই তাহাকে কেবল ভাল বলিয়াই মনে করেন নাই, নিজ সম্বলের, নিজ সম্পদের, নিজ অর্জ্জনের সব কিছু দিয়া তাহাই করিয়া আসিতেছেন। এই ইতিহাস আজ অপ্রচারিত রাখার কোনও সার্থকতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

এতদ্ব্যতীত, অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীবাবামণি পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ দুই

রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবার আগে ও পরে উভয় বঙ্গে, বিহারে, উড়িষ্যায়, উত্তর প্রদেশে ও আসামে অবিশ্রাম ভ্রমণ করিয়া তাঁহার অননুকরণীয় ভাষণ-সমূহ প্রদান করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে যে বিপুল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাও তুলনারহিত। যাঁহার সমগ্র বৎসরটারই প্রত্যেকটা দিন কোনও না কোনও বিরাট্ কাজের মধ্য দিয়া ব্যয়িত হইতেছে, তাঁহার সৃষ্ট এই আন্দোলনকে ভাষা দিয়া বর্ণনা করা আমরা অসাধ্য মনে করি। কত কত ধর্ম্মপ্রচারক ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কাছে লোকে শুনিয়াছে তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্ম্মমতেরই প্রশংসা। ইহার ফলে নিজ নিজ ধর্ম্মসঙ্ঘের পরিপুষ্টি ইঁহারা বিপুল ভাবে সাধন করিয়াছেন, এবং তাহারই মধ্য-বর্ত্তিতায় দেশ ও জনসমাজের কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। কিন্তু অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব তাঁহার বিরাট্ ধর্ম্মপ্রচার-আন্দোলনের মধ্যে তাঁহার নিজ মত ও নিজ পথকে প্রচার করিবার একটী সুযোগও গ্রহণ করেন নাই। দিনের পর দিন তিনি একই ভাষণ-মঞ্চ হইতে বক্তৃতা দিয়াছেন, এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার অতুলনীয় বাগ্মিতাপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ বচনামৃত মুগ্ধশ্রবণে পান করিয়াছে, কিন্তু ভাবমুগ্ধ শ্রোতাকে তিনি তাঁহার ধর্ম্মসঙ্ঘে যোগ দিবার জন্য একটী পরোক্ষ ইঙ্গিতও প্রদান করেন নাই। সমগ্র বিশ্ব-মানব জাতির যাহা সমস্যা, সমগ্র বিচ্ছিন্ন হিন্দু-সমাজের যাহা সমস্যা, তাহারই সমাধানের দিকে তিনি লক্ষ্য দিয়াছেন। তাঁহার সেবার ফলে ভারতের সকল কল্যাণ-কর্ম্মীরা নিজ নিজ ধর্ম্মসঙ্ঘের আদর্শে জনসেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তিনি নিজের শিষ্যদল বাড়াইবার জন্য তাঁহার অতুলনীয় বাগ্মিতাশক্তিকে জীবনে একটী দিনের জন্যও

প্রয়োগ করেন নাই। এই অসাধারণ দৃষ্টান্ত সমগ্র ভারতের কয়জন ধর্ম্মনেতার জীবনে পাওয়া যাইবে? অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব শিষ্য বাড়াইবার জন্য ব্যগ্র নহেন। যে যাঁহারই শিষ্য হউক, সকলেই যে তাঁহারই সন্তান, এমন প্রেমভরা অপক্ষপাত স্নেহ ভারতের উদারচেতা ধর্ম্মাচার্য্যদের জীবনেও অতি অল্পই দেখা যাইবে।

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের অপূর্ব্ব বাগ্মিতার যশোগাথা না শুনিয়াছেন, এমন লোক বোধ হয় আজিকার শিক্ষিত জনগণের মধ্যে খুব কমই আছেন। দিনের পর দিন ভাষণ দিতে থাকিলে সকল বক্তারই শ্রোতৃ-সংখ্যা কমিয়া যায়, আর ইঁহার বাড়ে। বরিশালে পনের দিন, শ্রীহট্টে একুশ দিন ইঁনি ভাষণ দিয়াছিলেন, শেষের দিক দিয়া মাঠেও জনসঙ্কুলান হয় নাই। বিদ্বজ্জন-পরিশোভিত ঢাকায় একই মঞ্চ হইতে ধারাবাহিক ছয় দিন, ময়মনসিংহে একই মঞ্চ হইতে ধারাবাহিক সাত দিন এবং রংপুরে একই মঞ্চ হইতে ধারাবাহিক চৌদ্দ দিন ইনি ভাষণ দিয়াছিলেন। শহর ভাঙ্গিয়া লোক জড় হইয়াছিলেন। এই অসাধারণ বাগ্‌বিভূতি পূর্ব্বে অল্প-সংখ্যক সমাজ-সেবকই প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু নিদারুণ পরিশ্রম করিয়া তিনি দেশ ও জাতির কাছ হইতে কি নিয়াছেন? কোথাও চাঁদা তোলেন নাই, কোথাও অর্থ-সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করেন নাই, কত স্থানে নিজ ব্যয়ে তিনি সভার আয়োজন করিয়াছেন, নিজ ব্যয়ে আলোর ব্যবস্থা করিয়াছেন, কত স্থানে সভার উদ্যোক্তারা যাতায়াত-পাথেয় দিবার কথাটা পর্য্যন্ত স্মরণ করেন নাই, তথাপি তিনি অমিত-বিক্রমে কাজ করিয়া গিয়াছেন এবং এই কাজের বিনিময়ে দেশের কাছে কিছুই

প্রার্থনা করেন নাই। এমন নিষ্কাম কর্ম্মী যদি আর কেহ থাকিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা অখণ্ডমণ্ডলেশ্বরের সহিত তাঁহারও শ্রীচরণে আমাদের ভক্তির কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

আজ ভারতের নানা স্থানে প্রাচীন ভারতের যৌগিক আসন-মুদ্রার শিক্ষার মধ্য দিয়া স্বাস্থ্যপূর্ণ দীর্ঘ জীবনের বিকাশ-সম্ভাবনা নানাভাবে পরীক্ষিত হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন যোগশাস্ত্রকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা, সমর্থন ও প্রচার করিয়া বর্ত্তমান যুগে প্রথম যিনি ইহাকে ভারতীয়-জীবনের প্রতি অবিশ্বাসীদেরও মনে প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি হইতেছেন পরমপূজ্যপাদ যোগাচার্য্য অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার ও অনন্যসাধারণ জনসেবার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া এই ক্ষুদ্রপরিসর ভূমিকায় সম্ভব নহে। কিন্তু তাঁহার অনেক দিন আগেকার রচিত একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠের সময়ে পাঠক যদি অবগত থাকেন যে, ইহা কেমন মহাপুরুষের রচনা, তাহা হইলে পুস্তক-নিবদ্ধ উপদেশ-সমূহের প্রতি প্রকৃত মূল্যদানে স্পৃহা বর্দ্ধিত হইবে। এই আশাতেই উপরিলিখিত বিষয়সমূহ লিখিত হইল—যদিও জানি যে, অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের অলোক-সামান্য প্রতিভার ও অবদানের পরিচয় ইহাতেই হইয়া যায় না।

পূর্ব্ববঙ্গের কুমিল্লান্তর্গত বাঘাউড়া গ্রামে অবস্থান কালে শ্রীশ্রী-বাবামণি তদ্দেশীয় শত শত যুবককে নিয়ত সঙ্গদান করিয়া এবং মৌখিক উপদেশের দ্বারা দুর্নীতির দুঃখময় দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে বাঘাউড়া পরিত্যাগ করিলে ত্রিপুরার যুবকেরা শ্রীশ্রীবাবামণির ব্রহ্মচর্য্য-বিষয়ক উপদেশের সারাংশ লিখিত-

রূপে পাইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ফলে ১৩৩১ সালে চৈত্র মাসে শ্রীশ্রীবাবামণি কলিকাতা হইতে একখানা পত্র দুই তিন ঘণ্টা সময়-মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া ডাকে প্রেরণ করেন। সেই পত্রখানাই প্রথম দুই তিন পংক্তি এবং শেষ দুই তিন পংক্তি বাদ দিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। চতুর্থ সংস্করণে গ্রন্থ সামান্য কতক বাড়িয়াছিল। ষষ্ঠ সংস্করণে গ্রন্থ স্মল-পাইকার পরিবর্ত্তে পাইকা টাইপে মুদ্রিত হয় এবং পার্শ্বটীকা প্রদান করা হয়। পঞ্চম সংস্করণে একচল্লিশটী ভগবৎ-সঙ্গীত ছিল কিন্তু "মন্দির" নামক গানের বহিতে শ্রীশ্রীবাবামণির প্রায় সকল সঙ্গীত একত্র গ্রথিত হইয়া ছাপান হইয়াছে বলিয়া ষষ্ঠ সংস্করণ হইতে সঙ্গীতগুলি তুলিয়া দেওয়া হয়। সপ্তম সংস্করণে দুই চারিটী শব্দ পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে।

যুবকদেরই এক পরমবন্ধু যুবকদের হিতার্থে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার সপ্তম সংস্করণ প্রচার করিতে পারিয়া আমরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। যুবক-সমাজের নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ এই যে, তাঁহারা নিজেরা এই গ্রন্থ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সমবয়স্ক ও অনু-বয়স্কদের মধ্যে গ্রন্থ-নিবদ্ধ ভাবসমূহের প্রচার-কল্পে চেষ্টাবান্ হইয়া ধ্বংসোন্মুখ জাতির অকাল-মৃত্যুর স্রোত নিবারণে কৃতসঙ্কল্প হউন। আরও অনুরোধ এই যে, প্রত্যেক যুবক যেন নিজ নিজ ভগিনী এবং ভগিনীতুল্যা সকল কিশোরীকে সৎপথে চলিতে প্রেরণা প্রদান করেন। ইতি—মাঘ, ১৩৫৭

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-১

নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

অষ্টম সংস্করণের নিবেদন

পরমপূজ্যপাদ অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব যেই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে রিয়াং, লুসাই ও রূপিণী জাতির মধ্যে কাজ করিতেছেন, সেই অতিশ্রম-জর্জ্জরিত অনবসর সময়েও কৃপাপূর্ব্বক "সরল ব্রহ্মচর্য্যের" অষ্টম সংস্করণে দুই একটি বাক্য সংযোজনের জন্য শ্রম নিয়াছেন। অষ্টম সংস্করণের ইহা পরম গৌরব।

বিশ্ববিখ্যাত আমেরিকান লেখিকা শ্রীমতী ডাঃ ভার্জিনিয়া মূরের লিখিত "The Whole World Stranger" নামীয় বিশ্ব-ভ্রমণের কাহিনী-গ্রন্থ স্বল্প-সময়ের জন্য দৈবক্রমে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, ভারতবর্ষ সম্পর্কে লেখিকা যে ৬৪ পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে একা শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব সম্পর্কেই তিনি চারি পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন। দুই একটী উক্তি উদ্ধার করিলেই যথেষ্ট হইবে। যথা,—

A person lives in his voice (page 168) "তাঁহার কণ্ঠস্বরে রহিয়াছে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।"

"What Swami Swarupananda Paramhansa said was less important than how he said it, backing up, under-writing each statement with that he was" (page 169) তিনি কি কথা বলিয়াছেন, তার চেয়েও তিনি কি ভাবে বলিয়াছেন, তাহাই ছিল বেশী লক্ষনীয়। প্রত্যেকটী বাক্য যেন তাঁহার উচ্চস্তরে স্থিতির জীবন্ত প্রমাণ-স্বরূপ নির্গত হইতেছিল। তিনি কি, তাহাই প্রতিটী কথায় স্ফুরিত হইতেছিল।

"There was no doubt about it ; This bachelor was transparently, overflowingly, invincibly happy, his out-giving tremendous (page 169) এবিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না যে, এই চির-ব্রহ্মচারী পরম আনন্দের অধিকারী, যে আনন্দ দুকূল প্লাবিয়া যায়, যে আনন্দ স্বচ্ছ, যে আনন্দ সকলকে জয় করে, তাঁহার আত্মস্ফূর্ত্তি কল্পনাতীত বিশাল।

"It was clear that, in spite of an education so thorough it included all the physical sciences as well as all types of yoga, the man had kept an innocent heart" (page 169) ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে, সর্ব্বপ্রকারে জড়-বিজ্ঞানে এবং সর্ব্ব-প্রকার যোগশাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও মানুষটী একটী নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক জীবন বহন করিয়া চলিয়াছেন।

"In the next few days his remembered wisdom was like piano chords underneath a running melody" (page 170) ইহার পরবর্ত্তী কয়েকটী দিন আমরা তাঁহার জ্ঞানকে এমন ভাবে স্মরণ রাখিতে বাধ্য হইলাম, যেন চলন্ত রাগিণীর অলক্ষ্যে পিয়ানোর তারও বাজিতেছে।"

শ্রীশ্রীবাবামণির সঙ্গ এই প্রথিতযশা আমেরিকান লেখিকাকে এমন ভাবে অভিভূত করিয়াছিল যে, ঐ গ্রন্থের অন্যত্র আমরা দেখিতেছি, দক্ষিণ ভারতের এক মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের চরণ দর্শন করিতে গিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন,—"Man of Wisdom" and "Holy Man", were the terms considered synonymous ? If so, this holy man (of South India) bore little outward

resemblance to that of the holy man, Swami Swarupananda Parambansa. For this one did not smile ; this one looked as if he had lived a long time in the desert, (page 206) ["The Whole World Stranger". by Virginia Moore, The Macmillan Company, New York, 1957]

বিগত স্বরূপানন্দ-জন্মোৎসবে কোন্নগর জনসভার সভাপতি, যিনি পৃথিবীর বহু দেশে পর্যটন করিয়াছেন এবং বিদ্যাবত্তার জন্য যশস্বী হইয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন,—Acharya Swarupananda far transcends what he has spoken or written. He will eclipse many a Polar Star—আচার্য্য স্বরূপানন্দ যাহা লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন, তিনি তাহা অপেক্ষা বহুগুণ বড়। তিনি প্রতিষ্ঠিত-যশক বহু ধ্রুবতারাকে অতিক্রম করিয়া যাইবেন।

যিনি চাঁদা তোলেন নাই তবু জনসেবার জন্য শ্রম করিয়াছেন, যিনি যশোলাভের সুযোগ খোঁজেন নাই কিন্তু মানবজাতির পরম মঙ্গলের প্রতি নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়াছেন, তাঁহার সম্পর্কে গণ-মানসে কেন শ্রদ্ধার আসন আপনা আপনি রচিত হইয়াছে ও হইতেছে, মাত্র তাহার ইঙ্গিত দিবার জন্যই উপরের কথা কয়টী উল্লেখ করিলাম। কিমধিকমিতি—বৈশাখ, ১৩৬৯।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-১

বিনীত নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

ওঁ

সরল ব্রহ্মচর্য্য

মানুষের বন্ধুর অন্ত নাই, কিন্তু প্রকৃত বন্ধু এ জগতে দুর্ল্লভ। কারণ, মায়া-মুগ্ধ মানব আত্মসুখকে যেমন করিয়া চিনিয়াছে, অপর কোনও সুখ বা আনন্দের অভিজ্ঞতা তাহার তেমন নাই। এই জন্যই মানুষ সম্পদের বন্ধুদিগকে বিপদের দিনে হারাইয়া নিজের পরবশতারূপ দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপের অশ্রু-ধারা বর্ষণ করে। নিজের উপরে নির্ভর করিতে শিখে নাই বলিয়াই অপরে যখন সাহায্য-হস্ত সঙ্কুচিত করে, তখন মানুষ ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে এবং নিজেকে এতদিন বিশ্বাস করে নাই বলিয়াই ভগবান্‌কে বিশ্বাস করিতে আজ সে কুণ্ঠিত হয়। অর্থাৎ আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহীনতাই তাহাকে অশান্তির জীবন্ত বিগ্রহ করিয়া তোলে।

বন্ধু

এ জগতে শান্তি কে না চাহে? কিন্তু যে নির্ভর করিতে জানে না, শান্তি তাহার জন্য নহে। আত্ম-নির্ভরের দ্বারাই ভগবন্নির্ভর লাভ হয়, আবার ভগবানে নির্ভর করিলে আত্মনির্ভর আপনিই আসে। তাই, মানুষ আর বিপদকে ভয় করে না, দুঃখকে গ্রাহ্যে আনে

নির্ভর

না, কষ্টকে কষ্ট বলিয়া আমল দেয় না। এই জন্যই নির্ভরের অবস্থা সাধকের পক্ষে এক মহামঙ্গলকর এবং পরম-সৌভাগ্য-সূচক অবস্থা। যুদ্ধক্ষেত্রের বলদুর্দ্ধর্ষ দুর্ব্বার সৈনিক অথবা সর্ব্বজনের অবহেলিত অন্নকষ্টক্লিষ্ট শীর্ণকায় সমাজ-সংস্কারক,—উভয়েই নির্ভরের শক্তিতে শক্তিমান্। নির্ভর মানুষকে নির্ভয় করে, তাই মানুষ বিজন অরণ্যেও বন্ধুহীন নহে। তোমাদের প্রত্যেককে আমি জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপে এইরূপ সবান্ধব দেখিতে চাহি। অর্থাৎ তোমাদিগকে অনলস এবং নিঃশঙ্ক দেখিতে চাহি। এই জন্যই আমি তোমাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের কল্যাণ-কথা কহিতে আসিয়াছি।

ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা তোমাদের প্রকৃত বন্ধু লাভ হইবে এবং তোমাদের কপট বন্ধুদিগকে চিনিতে পারিবে। তাই, আজ তোমাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী করিতে চাহিয়াছি।

তোমরা স্বীকার কর, আর গোপনই রাখ, তোমাদের সেবা করিতে যাইয়া আমি নির্দ্ধারিতরূপে জানিয়াছি যে, প্রতি সহস্রে নয় শত নিরানব্বই জন যুবক আত্মহত্যার অপরাধে অপরাধী। সমাজ-শাসনের বিশৃঙ্খলা, গার্হস্থ্য পবিত্রতার

আত্ম-পরিচয়

ব্যভিচার এবং ভারতের নিজস্ব শিক্ষা-সংস্কারে বিপর্য্যয়,—এই তিনটি প্রধান কারণে আজিকার কিশোর ও যুবক তাহার চরিত্রকে গঠন করিয়া তুলিবার প্রকৃষ্ট সুযোগ পাইয়া উঠিতেছে না;

পরন্তু বিসদৃশ চিন্তা-প্রবাহে পরিচালিত হইয়া দুর্জ্জন-সংসর্গের মধ্য দিয়া আত্ম-অপচয়ের কলুষিত কদভ্যাসে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে। আর্য্য-সন্তানের নিত্য-প্রতিপাল্য সাত্ত্বিক বিধিসমূহ লঙ্ঘন করিয়া আজিকার বালক এবং যুবক বীর্য্যহীন দেহে অপচয়িত ক্ষীণ মস্তিষ্কে চন্দন-ভারবাহী গর্দ্দভের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঞ্জীকৃত পুস্তকের পসরা বহন করিতেছে। ঈশ্বরবিশ্বাস হারাইয়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও অপরাপর সদ্‌গুণাবলীতে বঞ্চিত রহিয়া, মানুষ হইয়াও তাহারা অমানুষ থাকিয়া যাইতেছে ; ত্যাগাবতার, জগৎপাবন, অখণ্ড-পবিত্রতার আধার-স্বরূপ সদ্‌গুরুর সৎসঙ্গ না পাইয়া উন্নতি-মুখিনী সাত্ত্বিক বৃত্তিনিচয়ের উন্মেষ-সাধনে তাহারা অপারগ এবং ধর্ম্মে কর্ম্মে যথার্থ মানবীয় মহত্ত্ব অর্জ্জনে অসমর্থ রহিয়া যাইতেছে।

এই অবস্থার প্রতিকার আশু প্রয়োজন। এইজন্য ব্যক্তিগত-ভাবে আত্ম-গঠনের যেমন আবশ্যক আছে, তেমনি আবার আত্মগত মহদাদর্শকে প্রচারের দ্বারা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত করিয়া দিবারও উপযোগিতা রহিয়াছে। কারণ, ব্রহ্মচর্য্য-প্রচার যাঁহাদের নিত্য-কর্ত্তব্য, তাঁহারা ইহাকে স্বেচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছেন। অজ্ঞানান্ধ-জীবে ব্রহ্ম-জ্ঞান বিলাইবার জন্য যাঁহারা যোগী, দণ্ডী, সন্ন্যাসী

বা পরমহংসের পুণ্যময় ধর্ম্মসংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন, দেশের, দশের এবং জগতের আবশ্যকতা দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আজ যেন বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন যে ব্রহ্মচর্য্যহীন অগ্রাহী কুপাত্রে ব্রহ্মজ্ঞান জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করে না। কুল-গুরুগণ, সহজ-বিশ্বাসী মানব-সমাজ যাঁহাদের চরণতলায় নিজেদের ধ্যান-ধর্ম্ম সব সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহারা আজ বার্ষিক চৌথ আদায়ের অতিরিক্ত চিন্তার ঝঞ্ঝাট মাথা পাতিয়া লইতে স্বীকৃত নহেন। দক্ষিণা-বঞ্চিত, অন্নাভাব-ক্লিষ্ট অথবা চিপিটক-সর্ব্বস্ব কুল-পুরোহিত একান্ত দায়ে ঠেকিয়াই মাথার টিকি আর ললাটের ফোঁটা কষ্টে সৃষ্টে বজায় রাখিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ আজ মোদক বেচিতেই ব্যস্ত, আর শক্তিমান্ লেখক কামাতুর নায়ক-নায়িকার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে মগ্ন। ফলে, সমাজের ক্ষত-বিক্ষত সর্ব্বাঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যের শান্তি-প্রলেপ তাহাদিগকে নিজের চেষ্টাতেই মাখিতে হইবে, যাহারা অসংযমের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া তারপরে কল্যাণের পন্থা পাইয়াছে। এই জন্য আজিকার প্রত্যেক ব্রহ্মচর্য্যাভ্যাসীকে আংশিক ভাবে প্রচারকের কার্য্যভারও গ্রহণ করিতে হইবে।

ব্যাপকভাবে দেশ জুড়িয়া ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম-সমূহ প্রতিষ্ঠার বহু অন্তরায় আছে। এইসব বাধাকে অতিক্রম করিয়া দেশে গুরুকুলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কিছু সময়-সাপেক্ষ এবং প্রচুর ত্যাগ-

সাপেক্ষ হইবে। সর্ব্বস্ব-উৎসর্গকারী ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারকেরা নিজ নিজ অস্থি-পঞ্জরগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া হইলেও এই সকল বাধাকে লঙ্ঘন করিবেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু প্রত্যেক বড় কাজ করিতেই সময় লাগে। এই সময়টা তোমরা শুধু শুধু বসিয়াই বা থাকিবে কেন ? নিজ ব্রহ্মচর্য্য অটুট রাখিবার চেষ্টা তখনই সার্থক হইবে, যখন অপরাপরকেও এই শুভপথে টানিয়া আনিবার চেষ্টার তোমার অভাব হইবে না। নিজে কল্যাণবন্ত হইবার সাথে সাথে বিশ্ববাসী সকলকে সেই কল্যাণের অংশ বন্টন করিয়া দেওয়ার মধ্যেই বৃহত্তর কল্যাণ-লাভের চাবিটি লুকায়িত রহিয়াছে।

আত্মজীবনের চরিতার্থতার সঙ্গে সঙ্গে সকলের জীবন-গগনে সুখ-সূর্য্যের অভ্যুদয় তোমাকে অবশ্যই দেখিতে চেষ্টা পাইতে হইবে, নতুবা তোমার জীবনের গৌরব মলিন রহিয়া যাইবে। অসংযত জীবনের দুঃখ ও বেদনা যদি বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে অপরাপরকে সাবধান করিয়া দিবার অধিকার এবং প্রয়োজন তোমার আছে।

তোমাকে এমন ধারা চলিতে হইবে যে, তোমার দৃষ্টান্তই যেন শত শত ভ্রষ্টার জীবনে উপদেশের কার্য্য করে। তাহা হইলেই ধীরে ধীরে দেশব্যাপী কল্যাণ-প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠনের অনুকূল অবস্থানিচয় সৃষ্ট হইতে থাকিবে ; দিন দিন লোকমত পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে এবং কল্যাণ-কর্ম্মীর সংখ্যা

দৃষ্টান্তের শক্তি

পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। তোমাদের পবিত্রোন্নত মহনীয় জীবনের জ্যোতিঃ এবং তোমাদের তপোনিষ্ঠাসম্ভূত অমোঘ প্রভাব প্রতিকূলাচারীরও হৃদয়কে দ্রবীভূত করিবে এবং সবল বিরোধীকে অজ্ঞাতসারে ঘাড় ধরিয়া হেঁটমুণ্ড করিয়া দিবে। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াও যাঁহারা উপযুক্ত সংসাহসের অভাবে প্রচলিত নিয়ম-বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া বা পাশ কাটাইয়া এড়াইয়া যাইতে পারিতেছেন না, তাঁহারা তোমাদের দেদীপ্যমান জীবনের দৃষ্টান্তে সমুৎসাহিত হইয়া নিজ নিজ বংশধরদিগকে নিঃস্বার্থকর্ম্মা ত্যাগীগণের হস্তে নিঃসঙ্কোচে সমর্পণ করিয়া দিতে ভরসা পাইবেন। দৃষ্টান্তের অভাব বলিয়াই মানুষ সন্দেহ করে, ভয় পায়, ভুল বোঝে। আজ তোমাদিগকে নিজ নিজ জীবন-বৈশিষ্ট্যের বিকাশ-সাধনের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের কুসংস্কার-পরিবেষ্টিত তমোঘোর মন হইতে সন্দেহ দূর করিতে হইবে, সংশয় নাশ করিতে হইবে, ভ্রান্তি ঘুচাইতে হইবে।—দৃষ্টান্ত দৃষ্টান্তকে সৃষ্টি করে।

সর্ব্বদা মনে রাখিও—"মরণং বিন্দুপাতেন, জীবনং বিন্দু-ধারণাৎ।" বীর্য্যক্ষয়েই মৃত্যু, বীর্য্যধারণেই জীবন।

সতর্কতার আবশ্যকতা

কখনও ভুলিও না,—"যার যত বীর্য্যক্ষয়, তার তত রোগের ভয়।" যাহাতে বীর্য্যক্ষয় হয় বা বীর্য্যের তরলতা সম্পাদিত হয়, এমন চিন্তা, বাক্য, দৃশ্য এবং কার্য্য

হইতে প্রাণপণ যত্নে দূরে থাকিতে হইবে। আত্মরক্ষায় সদা-সতর্কতা চাই। পূর্ব্ব-জীবনের দৈহিক বা মানসিক অভ্যাসের দোষে কখনও ভ্রমবশাৎ সতর্কতা হ্রাস প্রাপ্ত হইলে, হতাশ না হইয়া সুদৃঢ়তর সঙ্কল্প করিয়া আরও তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইবে, যেন, বীর্য্যের ক্ষয়কর বা তারল্য-বিধায়ক কোনও চিন্তায় বা কার্য্যে মতি না যায়।

বীর্য্যের উৎপত্তি

যাহা কিছু আমরা আহাররূপে দেহমধ্যে পরিগ্রহণ করি, জঠরাগ্নির দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া তাহার সারভাগ রস নামক ধাতুতে পরিণত হয়, আর, বর্জ্জনীয় অংশটুকু মলমূত্রাদি আকারে বহির্গত হইয়া যায়। এই রসের সারভাগ যকৃতের উত্তাপে পুনরায় পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া শোণিতে রূপান্তরিত হয়। স্বকীয় উত্তাপে পরিপাক পাইয়া এইভাবে রক্তের সারভাগ মাংসে, মাংসের সারভাগ মেদে, মেদের সারভাগ অস্থিতে, অস্থির সারভাগ মজ্জাতে এবং সর্ব্বশেষে মজ্জার সারভাগ শুক্র বা বীর্য্য নামক জীবনপ্রদ মহাধাতুতে পরিণত হয়। পরিগৃহীত খাদ্যের এইভাবে শুক্রে পরিণতি পাইতে অন্ততঃ তিনদিন লাগে এবং এক বিন্দু বীর্য্য উৎপন্ন হইতে শরীরে অন্ততঃ পক্ষে অর্দ্ধসের বিশুদ্ধ শোণিতের সৃষ্টি আবশ্যক। এই জন্যই কেহ কেহ হিসাব দিয়াছেন যে, শরীর মধ্যে একবিন্দু বিশুদ্ধ বীর্য্য উৎপন্ন হইতে অন্ততঃ পক্ষে ছত্রিশ

দিন পর্য্যন্ত আহার্য্য দ্রব্য উৎকৃষ্টরূপে জীর্ণ হওয়া এবং সর্ব্ব-প্রকার বীর্য্যক্ষয় বন্ধ থাকা আবশ্যক। শরীরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমাণু-সমূহের দ্বারাই শুক্রধাতু নির্ম্মিত হইয়া থাকে, এইজন্য একমাত্র শুক্রক্ষয়েই রসক্ষয়, রক্তক্ষয়, মাংসক্ষয়, মেদক্ষয়, অস্থিক্ষয়, মজ্জাক্ষয় এবং শুক্রেরও যে সারভূত তেজোময় পদার্থ, সেই ওজোধাতুরও ক্ষয় হয়। অতএব, সাধু সাবধান! ভ্রমেও যেন এই মহাবস্তুর ক্ষয়কর কোনও কাজে নিজেকে রত করিও না।

দুগ্ধমধ্যে মাখন যেমন ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত থাকে, শরীরের সারভূত বীর্য্যও তেমনি রক্তের সহিত একেবারে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে মিশিয়া থাকে। দুগ্ধ মধ্যে মন্থন-দণ্ড দ্বারা

বীর্য্যের অবস্থান ও ক্ষয়

বারংবার আলোড়ন করিতে করিতে যেমন মাখনটুকু পৃথক্ হইয়া উঠিয়া আসে, যে সকল কার্য্যে শুক্রক্ষয়-সম্পর্কিত স্নায়ু-মণ্ডলীর উত্তেজনা হয় অথবা ঐ সকল শিরা, উপশিরা ও ধমনীর মধ্য দিয়া রক্ত-প্রবাহ প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, সেই সকল কার্য্যেও তেমনি রক্ত হইতে বীর্য্যটুকু অণ্ডকোষের সাহায্যে পৃথক্ হইয়া আসে এবং শুক্রকোষে আসিয়া ব্যয়িত হইবার জন্য পুঞ্জিত হয়। পুরুষেন্দ্রিয়ের উপযুক্ত উত্তেজনার সুযোগ পাইলেই ইহা দেহ হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে এবং বুদ্ধির ভ্রষ্টতা, বলের হ্রাস,

দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, উৎসাহের অভাব, চিন্তাশক্তির অপচয়, মেধার ক্ষয়, পাচকাগ্নির মন্দতা, ক্ষয়জ রোগের প্রবণতা এবং দৈহিক ও মানসিক সর্ব্বপ্রকার অশান্তি ও উৎপাত আনয়ন করে।

স্নায়ুমণ্ডলীর যে স্বাভাবিক উত্তেজনাহেতু রক্ত-মধ্য হইতে বীর্য্য পৃথক্ হইয়া পড়ে, তাহা প্রধানতঃ কামমূলক। কামদৃশ্য দর্শন, মাতৃবুদ্ধি ব্যতীত অপর ভাবে নারীর মূর্ত্তি বা প্রতিমূর্ত্তি দর্শন, ইন্দ্রিয়-সুখাদির লিপ্সাবর্দ্ধক পুস্তক পাঠ বা অভিনয় দর্শন, রুচি-বিকৃতিকর হাস্যকৌতুক, তরল রহস্যালাপাদি, স্ত্রীগণমধ্যে বৃথা অবস্থান, ভক্তিভাব ব্যতীত অপর ভাবে স্ত্রীলোকের মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলা, অন্তরাল হইতে স্ত্রীলোক

বীর্য্যক্ষয়ের কারণ

দর্শনের ঔৎসুক্য, কামচিন্তা, পুরুষেন্দ্রিয়ের অপব্যবহার প্রভৃতি কারণে বীর্য্যক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব নাচ গান, থিয়েটার, নভেল প্রভৃতি এবং কুসঙ্গ বিষবৎ পরিহার করিয়া চলিবে।

বীর্য্যক্ষয়ের প্রতিষেধ

অনুদ্বিগ্ন-চিত্তে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সচ্চিন্তা, ভগবদ্-ধ্যান, মহাপুরুষ-স্মরণ ও উন্নতিলাভ-সঙ্কল্পে ব্যায়াম প্রভৃতির দ্বারা দৈহিক উত্তেজনার মূল-কারণ-সমূহের প্রতিষেধ হয়। এইজন্য ইহারা ব্রহ্মচর্য্যের পরম সহায়। দুশ্চিন্তা, মানসিক অশান্তি, সদা সন্দিগ্ধ ভাব, আত্ম-অবিশ্বাস প্রভৃতি স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনা ও

অবসাদ উভয়ই সৃষ্টি করে, অতএব ইহারা ব্রহ্মচর্য্য-নাশক। ক্ষুধাহীন দেহে সাধ্যাতীত ব্যায়াম বা আনন্দহীন কঠোর পরিশ্রম রাত্রি-জাগরণ, অতিভোজন, অতিশয় বাচালতা, মস্তিষ্কের উপর উৎপীড়ন, সাধ্যাতীত ক্ষুধার বেগ সহ্য করা প্রভৃতিও ব্রহ্মচর্য্যের পক্ষে বাধাজনক। পরিশেষে ভুলিলে চলিবে না যে, আলস্য এবং ক্রোধ ব্রহ্মচর্য্যের পরম শত্রু। আলস্য মনকে কুচিন্তার আকর এবং ক্রোধ মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করে বলিয়া অলস এবং ক্রোধী ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে বীর্য্যক্ষয় অত্যন্ত বেশী হয়। বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, খিট্‌খিটে লোকগুলির শরীর কখনও হৃষ্টপুষ্ট হয় না। কারণ, মনোবৃত্তিকে দমিত রাখার শক্তি তাহাদের থাকে না। ফলে ক্রোধী ব্যক্তি কামুক হয়, কামুক ব্যক্তি ক্রোধী হয়।

বাঁচিয়া থাকিতে হইলেই মানুষকে সংগ্রাম করিতে হয়। যে ব্যক্তি অনুদ্বিগ্ন, সকল সংগ্রামে সে-ই বিজয়শ্রী লাভ করে। ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল সদাচারসমূহ পালনের দ্বারা এই অনুদ্বিগ্নতা লাভের সহায়তা হয়। পরন্তু যে ব্যক্তি কথঞ্চিৎ অনুদ্বিগ্নতা পরিমাণেও অনুদ্বিগ্ন, ব্রহ্মচর্য্যের সুপবিত্র তথা ব্রহ্মচর্য্য নিয়মাবলী সুশৃঙ্খলতার সহিত দীর্ঘকাল পালন করিবার ফলে তাহার অক্ষুণ্ণ-বীর্য্যত্ব লাভ হয়। বীর্য্য রক্ষার জন্য তোমাকে শত বাধাতেও হাস্যোৎফুল্ল থাকিতে হইবে এবং যাবতীয় হিতকর নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিতে হইবে। যে শান্ত ভাব লাভ করিয়া মানুষ নিজেকেই

নিজের পরম বান্ধব বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে এবং সকল অনল-বর্ষণের মধ্যেও শ্রীভগবানের স্নেহশীতল আশীষকে অনুভব করে, ইহার ফলে তাহা তোমার মধ্যে স্বভাব-সংস্কারের ন্যায় পরিস্ফুট হইবে।

সংক্ষেপে এইটুকু মনে রাখিতে পার যে, যাহাকিছু স্নায়ুর উত্তেজনাকারক, তাহাই আংশিক ভাবে ব্রহ্মচর্য্যনাশক এবং যাহা কিছু স্নায়ুর স্নিগ্ধতা-সম্পাদক, তাহাই ব্রহ্মচর্য্যের উপচায়ক ও হিতকারক।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিবে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের সচ্চিন্তা, সৎকার্য্য, সদনুশীলনকে ব্যাঙ্কে টাকা জমানোর মত স্থায়ী লাভজনক কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিবে। জগতের অধিকাংশ মহান্ পুরুষ জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিসমূহের ভিত্তি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গায়কের গান-শিক্ষা, জাপকের জপশিক্ষা, যোগীর যোগশিক্ষা, কবির কাব্যচর্চ্চা, দার্শনিকের দর্শনালোচনা এবং ধ্যানীর ধ্যানানুশীলনের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সময়। কখনও জাগিয়া ঘুমাইবে না,—জাগরিত হওয়া মাত্র ইষ্টদেবতার পরমমহানাম স্মরণ এবং বন্দনা করিতে করিতে শয্যাত্যাগ করিবে।

"খেয়ে হাগে, শুয়ে জাগে
সে আবার কোন্ কাজে লাগে?"

গাত্রোত্থানের পরে মলমূত্র ত্যাগ করিবে। শৌচান্তর আম্র-নিম্ব-খদিরাদির শাখাদ্বারা উৎকৃষ্টভাবে দন্তমার্জ্জন করিবে। জিভ্‌ছোলা দিয়া জিহ্বা চাঁছিয়া ফেলিবে এবং গল-গহ্বরে অঙ্গুলী প্রয়োগ করিয়া উহা উত্তমরূপে পরিষ্কার করিবে। শীতল জলের দ্বারা চক্ষু সাবধানতার সহিত ধৌত করিবে এবং চক্ষু খুলিয়া সাতাইশবার ভ্রূমধ্যে জলের ঝাপ্‌টা দিবে। তিন বেলা স্নানের অভ্যাস না থাকিলে গামছা দিয়া শরীরের আবৃত এবং অনাবৃত সর্ব্বাংশ মুছিয়া ফেলিবে। প্রাতঃকালে ব্যায়ামের অভ্যাস থাকিলে মল-মূত্র ত্যাগের পর সাধারণ ভাবে হাত মুখ ধুইয়া ব্যায়াম করিয়া উপযুক্ত বিশ্রামের পর স্নান করিবে এবং স্নান-কালে সর্ব্বাঙ্গের শুদ্ধিবিধান করিবে। মলত্যাগ সম্বন্ধে সর্ব্বদা অবহিত থাকিবে। মলবেগ না হইলেও প্রত্যহ দুইবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে মলস্থানে যাইবেই।—

প্রাতঃকালীন কর্ত্তব্য

"সকাল বিকাল মাঠে যায়,
তার কড়ি কি বৈদ্যে পায়?"

প্রাতঃস্নানের পর উপাসনা করিবে। যার যার ধর্ম্মানুযায়ী গ্রন্থ (হিন্দুর পক্ষে গীতা, অখণ্ডগণের পক্ষে অখণ্ড-সংহিতা অবশ্যপাঠ্য) অধ্যয়ন, ভজন বা কীর্ত্তন, ব্রহ্মগায়ত্রী-জপ বা গুরু-দত্ত নামের সেবা প্রভৃতির দ্বারা উপাসনা করিবে। যাহারা এখনও সদ্‌গুরুর-কৃপাপ্রাপ্ত নহে, তাহারা ভগবানের নিকটে তেজ, শক্তি,

উপাসনা

বীর্য্য, জ্ঞান, কর্ম্মঠতা, সৎসাহস, মনোযোগ, পরোপচিকীর্ষা প্রভৃতি প্রার্থনা করিবে। যাহারা দীক্ষাপ্রাপ্ত, তাহারা গুরু-নির্দ্দিষ্ট সাধনকে সকল উপাসনার শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিবে। চিত্তে প্রশান্তি না আসা পর্য্যন্ত উপাসনা করিবেই। এই সকল যাবতীয় কর্ত্তব্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সুনিষ্পন্ন হইয়া যাওয়া আবশ্যক।

প্রাতেই হউক, বৈকালেই হউক, ব্যায়াম অন্ততঃ একবেলা তোমাকে করিতেই হইবে। দ্বাদশ বর্ষের নিম্নবয়স্ক বালকগণের পক্ষে পদ্ধতিবদ্ধ ব্যায়াম অপেক্ষা খেলাধূলাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু দ্বাদশ বর্ষ হইতে ঊনত্রিংশ বর্ষ বয়স্ক বালক ও যুবকদের নিয়মিত ও প্রণালীবদ্ধ ব্যায়াম বাধ্যতামূলক জানিবে।

ব্যায়াম

এই বয়সের মধ্যেই শরীরের শ্রেষ্ঠ গঠন লাভ হয়। সুতরাং যাহারা এই সময়ে সুকঠোর ব্যায়ামের দ্বারা শরীরের প্রত্যেকটী স্নায়ু ও মাংসপেশীকে বজ্রদৃঢ় করিয়া তুলিতে আলস্য করে, তাহারা নিতান্তই হত-ভাগ্য, সন্দেহ নাই। সুযোগ থাকিতে সুযোগের অব্যবহার ও অপব্যবহার করিয়া যাহারা দেহ গঠন করে নাই, তাহারা যেমন দুর্ভাগা, ভগবান যাহাদিগকে জন্ম হইতে অন্ধ বা খঞ্জ করিয়াছেন, আমি তাহাদিগকে তত দুর্ভাগা মনে করি না। "রামমূর্ত্তি" বা "ভীমভবানী" বলিয়া লোকে ঠাট্টা করিবে, এই ভয়ে ভীত হইয়া যাহারা ব্যায়াম-চর্চ্চার সুযোগ গ্রহণ করে না, তাহারা

মুর্খের মুর্খ। নিন্দা-বিদ্রূপে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িও না। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় চলিয়া যাইতেছে ; একবার গেলে আর ফিরিয়া আসিবে না। উন্নতির পথে যারা সমালোচনার কণ্টক নিক্ষেপ করে, তোমার জীবন অগঠিত থাকিলে বিপদের দিনে তাহারা কেহ আসিয়া তৃণগাছটী দিয়া তোমার সাহায্য করিবে না। বরঞ্চ—যদি প্রচুর শক্তি, সামর্থ্য ও কর্ম্মক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পার, একদিন ইহারা প্রত্যেক বিপদ-আপদে তোমারই সাহায্য-প্রার্থী হইবে। জগতের ইহাই রীতি, সকলেই শক্তের ভক্ত।

নিন্দায় উপেক্ষা কর

আজ যদি ইহাদের সমালোচনার তিক্ততা নিঃশব্দে সহ্য করিয়া একান্তচিত্তে জীবন গঠন করিতে পার, কালই দেখিও, ইহাদের মুখে প্রশংসা-গুঞ্জন ধ্বনিত হইবে। উনত্রিংশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই দেহকে যতটুকু শ্রীবৃদ্ধি দিবার দিতে হইবে, ইহার পরে দেহ আর বড় বাড়ে না। সুতরাং কোন বাধা, অসুবিধা, নিন্দা বা তিরস্কারকে গ্রাহ্য করিবার তোমার অবসর নাই।

আজই ব্যায়াম আরম্ভ কর এবং একবার যদি আরম্ভ করিয়াছ, পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কঠোর ভাবে ব্যায়ামের সাধনা করিতে হইবে। হিন্দুস্থানী পালোয়ানেরা বৃহস্পতিবার এবং পাশ্চাত্যেরা রবিবার ব্যায়াম বাদ দেন। তোমরা ইচ্ছা করিলে এই নিয়ম পালন করিতে পার। সপ্তাহে

ব্যায়াম-বিরতি একদিন ব্যায়ামে বিরতি এই হিসাবে ভাল যে, বিরতির পরদিন হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পতর ব্যায়ামে সমান সুফল হয়। নতুবা ব্যায়ামের কাল-পরিমাণ কেবল বাড়াইয়া যাইতে হয়। সপ্তাহে একদিন বিরতির সুযোগ পাইয়া যাহাদের প্রায়ই ব্যায়াম বন্ধ রাখিবার শখ হয়, তাহাদের পক্ষে এই বিরতির নিয়ম ক্ষতিকর।

কয়েকদিন পরে পরেই ব্যায়ামের পরিমাণ একটু একটু বাড়াইবে। কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিবে, ব্যায়ামাভ্যাসে পরিপূর্ণ সুফল পাইতে হইলে তোমার সবটুকু মন দেহের মাংসপেশী-গুলির মধ্যে নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। এই সময়ে মনকে অন্য-

ব্যায়ামকালীন মনঃসন্নিবেশ দিকে ধাবিত হইতে দিলে ব্যায়ামের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। সমগ্র দেহখানা এবং ইহার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমার হুকুমের চাকর মাত্র, এই কথা সম্যক্ মনে রাখিবে। চাকরের উপরে মনিবের পূর্ণ দৃষ্টি না থাকিলে চাকর মনিবকে ফাঁকি দেয়। সুতরাং যে অঙ্গের ব্যায়াম হইতেছে, সেই অঙ্গে মন স্থির করিবে। মাংসপেশীগুলির আকুঞ্চন ও প্রসারণ যতদূর সম্ভব ধীর ও কষ্টসাধ্যভাবে সম্পাদন করিবে। অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যায়াম অল্প করা অপেক্ষা সহজসাধ্য ব্যায়াম অধিক করা ভাল। দেহকে পুষ্ট ও কষ্ট-সহিষ্ণু করাই ব্যায়ামের প্রধান উদ্দেশ্য। মনকে গাছে-মাছে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিলে

প্রকারের বিধিনিষেধের বজ্রবন্ধন হইতে মুক্ত, সে সকল নির্ব্বিরোধ নিরুপদ্রব, নিরুদ্বেগ প্রাণায়াম যোগীগণের নিত্য অভ্যাসের মধ্য দিয়া শিষ্য-প্রশিষ্যানুক্রমেই বাঁচিয়া রহিয়াছে; আর গ্রন্থলিখিত প্রাণায়ামনিচয় যাদুঘরে রক্ষিত মিশরের শবদেহের ন্যায় আমাদের অদ্ভুতকর্ম্মা পূর্ব্বপুরুষগণের অলোক-সামান্য প্রতিভার পরিচয়স্থল হইয়া রহিয়াছে মাত্র।

সুতরাং তোমরা ব্যায়াম ব্যতীত অপর সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাসকে ইচ্ছাপূর্ব্বক অল্পদূরগামী বা দীর্ঘকালস্থায়ী করিতে চেষ্টা পাইবে না। পরন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি কখন কিভাবে চলিয়াছে, সেই দিকে সর্ব্বদা তীব্র লক্ষ্য রাখিবে। ক্লাসের দুষ্ট ছেলের প্রতি মাষ্টার মহাশয় একাগ্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিলে ছাত্রের দুষ্টামি যেমন আপনি তিরোহিত হয়, তেমনি চঞ্চল শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকেও মনের একাগ্র লক্ষ্য পড়া মাত্রই বিনা প্রয়াসে, বিনা বলপ্রয়োগে প্রাণবায়ু স্বাভাবিক ভাবে ধীরতা ও গভীরতা লাভ করে।

শ্বাস-প্রশ্বাসে লক্ষ্য রাখা

মুক্ত বাতাসে ব্যায়াম করাই বিধেয়। শীতকালে একটা গেঞ্জি গায়ে বা আবৃত স্থানে খালি গায়ে এবং গ্রীষ্মকালে সর্ব্বদা খালি গায়ে ব্যায়াম করিবে। সুবিধা হইলে দেহের স্ফীতি ও সঙ্কোচন লক্ষ্য করিবার জন্য সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইখানা অথবা শুধু সম্মুখেই একখানা বড় আয়না রাখিয়া ব্যায়াম করিবে। ইহাতে মনঃসংযমের সহায়তা হয় বলিয়া ব্যায়াম অধিকতর

চিত্তাকর্ষক ও কার্য্যকরী হয়। একপ্রকারের ব্যায়াম শেষ করিয়া আর এক প্রকারের ব্যায়াম আরম্ভ করিতে দুই এক মিনিট বিশ্রাম করিয়া পেশীগুলিকে একটু শিথিল করিয়া লইবে। সকল ঋতুতেই ব্যায়াম চলে, নিত্য-ব্যায়ামাভ্যাসীর পক্ষে কোনও ঋতুই বর্জ্জনীয় নহে। কাস, শ্বাস, হাঁপানী, ক্ষয়, রক্তপিত্ত ও শোথ রোগীর পক্ষে অধিকাংশ স্থলেই ব্যায়াম নিষিদ্ধ। ভ্রমণই তাহাদের পক্ষে হিতকারী।

ব্যায়াম

যতক্ষণ জিহ্বা ঈষৎ শুষ্ক, পিপাসার উদ্রেক, কপাল, নাসিকা, গাত্রসন্ধি ও দুই বগলে অল্প অল্প ঘর্ম্মোদ্গম না হয়, ততক্ষণ ব্যায়াম বিধেয়।

প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালই ব্যায়ামের পক্ষে প্রশস্ত, অন্য সময়ে ব্যায়াম করিলে শরীরের বিশেষ কোনও উপকার হয় না।

ব্যায়ামের অব্যবহিত পরে স্নান, আহার বা জলপান নিষিদ্ধ। ঘরের মধ্যে ব্যায়াম করিলে শ্রান্তি দূর না হইতে, দেহের স্বেদ-বারি না শুকাইতে এবং হৃৎস্পন্দনের স্বাভাবিক গতি ফিরিয়া না আসিতে সহসা উন্মুক্ত বায়ুতে আসিবে না। ব্যায়ামের পরক্ষণেই স্নান অহিতকর।

ব্যায়ামকারীর জন্য ঘৃত, দুগ্ধ, বাদাম প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য জুটিলে খুব ভাল কথা। তোমাদের অনেকেরই জুটিবে না, তাহা আমি জানি। অতএব ঘৃত-দুগ্ধের জন্য হা-হুতাশ না করিয়া যাহার যাহা আহার্য্য জোটে, তাহারই উপর নির্ভর

ব্যায়াম ও আহার

করিয়া দেহের শক্তি সঞ্চয় কর। ডাল ভাত খাইয়া প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, এমন শত শত লোক এখনও এই ভেতো বাঙ্গালীর দেশেই আছেন। বীর্য্যক্ষয় করিও না, আহার্য্য দ্রব্য উৎকৃষ্ট ভাবে চর্ব্বণে শৈথিল্য করিও না, নিয়মিত ব্যায়াম করিতে একদিনও ভুলিও না,—এই তিনটি নিয়ম পালন করিয়া যদি কেবল শাকপাতাই খাও, তবু তোমার দেহে সিংহের শক্তি আসিবে। যত সামান্য বস্তুই আহার কর না কেন, তাহার সবটুকু সার যদি দেহমধ্যে রাখিতে পার, তবেই ত' তোমরা জগতের শ্রেষ্ঠ বীরে পরিণত হইতে পার। মলের সহিত আহারীয় বস্তুর বিন্দুমাত্র সারাংশও বহির্গত হইতে দিবে না—এই সঙ্কল্প লইয়া আহার করিও। দুগ্ধ-ঘৃত মিলিলে মৎস্য-মাংস পরিত্যাগ করিও। নতুবা নিজ নিজ কৌলিক বা প্রাদেশিক প্রথানুযায়ী মৎস্য-মাংসও দেহ-রক্ষার জন্য সেবন করিবে। কিন্তু অতিরিক্ত মৎস্য-মাংস সেবন ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার্থীর পক্ষে ক্ষতিকর। কামচিন্তা ও লোভপূর্ব্বক সাত্ত্বিক খাদ্য সেবন করিলেও তাহার ফল তামসিকই হয়। ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবে।

প্রাতঃকালে যাহারা ব্যায়াম করিবে না, তাহারা উপাসনাদির পর প্রাতর্ভ্রমণ করিবে। প্রাতর্ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগকে প্রণাম করিবে।

মনে মনে প্রণাম করিলে চলিবে না, ভক্তিভরে পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবে। অন্যান্য গুরুজনদিগকে না পাইলে শুধু পিতামাতার পাদ-বন্দনা করিবে। যখন আর কাহাকেও পাইবে না, তখন অন্ততঃপক্ষে জননীকে বিশ্ব-জগৎ-প্রসবিনী জ্ঞানে প্রণাম করিবেই। তিনি স্বর্গগতা হইয়া থাকিলে তাঁহাকে দেশমাতৃকা ও জগজ্জননীর সহিত অভেদজ্ঞানে "মাতরম্" বলিয়া মনে মনে বন্দনা করিবে। মাতৃ-পিতৃ-বন্দনা যে জীবন-গঠনের, চরিত্র-সাধনের, বীর্য্য-লাভের কত বড় সহায়িকা, একথা আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। মাতৃ-পিতৃ-ভক্তির অনুশীলনের অপরিমেয় সুফল সম্পর্কে আমি তোমাদিগকে আমার ব্যক্তিগত জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনা হইতে সাক্ষ্য দিতে পারি। মাতাপিতার প্রসন্ন মন আর অকুণ্ঠ আশীর্ব্বাদ সন্তানকে কর্ত্তব্যকর্ম্মে অমিত শক্তি দান করে। স্বল্প প্রয়াসে এমন বিপুল বিত্ত আহরণের সুযোগকে তোমরা কদাচ পরিত্যাগ করিও না।

মাতৃ-পিতৃ বন্দনা

মুক্ত বায়ু এবং মুক্ত আলোকে অধ্যয়ন করিবে। আসন করিয়া বসিয়া মেরুদণ্ড এক সরল রেখায় রাখিয়া, দেহ ও মস্তক স্থির করিয়া একখানা ক্ষুদ্র জলচৌকী, বাক্স বা ডেস্কের উপরে পুস্তক রাখিয়া পড়া আরম্ভ করিবে। পাঠাভ্যাসকালে ঝুলিবে না বা হেলিবে দুলিবে না। স্পষ্ট-স্বরে অধ্যয়ন করিবে,—স্পষ্ট উচ্চারণ চিন্তাশক্তির স্পষ্টতা সাধন করে। পড়িবার কালে প্রত্যেকটি

অধ্যয়ন

আহারের স্থান এবং আহার্য্য-বস্তু পবিত্র ও পরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক।

নিবেদন না করিয়া অন্নগ্রহণ করিবে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি নিজেকে ব্রহ্ম জানিয়া এবং অন্নকেও ব্রহ্ম জানিয়া অন্নগ্রহণ দ্বারা ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধান করিবেন। ভক্ত শ্রীভগবানের মানসিক সেবা করাইয়া প্রসাদ লইবেন। অখণ্ড-সাধক তিনবার প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ পূর্ব্বক আহার্য্য বস্তুতে তিনটী জলের ছিটা দিবেন এবং পরমেশ্বরের নাম স্মরণের দ্বারা আহারীয় বস্তুর যাবতীয় সূক্ষ্ম অপবিত্রতা দূরীভূত হইয়া যাইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিবেন। তৎপরে খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মন

আহারীয় নিবেদন

ভ্রূমধ্যে রাখিয়া ধীর শ্বাসে এবং ধীর প্রশ্বাসে মোট তিনবার বা পাঁচবার ভগবানের দ্বাদশাক্ষর নাম (ওঁ আদ্যাশক্তিঃ পরমানন্দং ব্রহ্ম) জপ করিবেন। আহারীয় বস্তু দ্বারা শ্রীভগবানেরই অর্চ্চনা হইতেছে, তৎকালে তিনি এইরূপ ভাবনা করিবেন। তৎপরে করতলে জল লইয়া অর্থ-ভাবনা পূর্ব্বক "ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং ভবামি" অর্থাৎ "আমি জগতের কল্যাণকারী হইতেছি," এই মন্ত্র তিনবার মনে মনে উচ্চারণ করিয়া পুনরায় ওঙ্কার স্মরণ করিতে করিতে গণ্ডূষ গ্রহণ করিবেন। আহার্য্য গ্রহণকালে গ্রাসে গ্রাসে এবং প্রতি চর্ব্বণে ভগবানের নাম জপ করিবেন। আহার শেষ হইলে নাভিমূলে মন রাখিয়া

পুনরায় একগণ্ডূষ জল লইয়া তিনবার জগন্মঙ্গল-মন্ত্র জপ করিয়া ওঙ্কার উচ্চারণ করিতে করিতে গণ্ডূষ গ্রহণ করতঃ পাত্র ত্যাগ করিবেন। পাত্র-ত্যাগের পরে আর আহার করিবেন না। (বিস্তারিত "শ্রীশ্রীউপাসনা প্রণালী"তে ১২।১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) মুসলমান "বিস্মিল্লাহ" নাম উচ্চারণ করিয়া ভক্তিভাবে আহার্য্য বস্তু গ্রহণ করিবেন। মোট কথা, অনিবেদিত অন্নপানীয় কল্যাণপ্রার্থীর পক্ষে অগ্রাহ্য।

পরিপূর্ণ আবেগের সহিত নিবেদন করিতে পারিলে আহারীয় বস্তু সর্ব্বপ্রকার সূক্ষ্ম অকল্যাণ ও অপবিত্রতা হইতে মুক্ত হয়। খাদ্যদ্রব্য শুধু পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্নভাবে রক্ষিত হইলেই তাহা গ্রহণীয় হইবে, এমত নহে। উহা সর্ব্বপ্রকার অপবিত্র

খাদ্যের পবিত্রতা

দৃষ্টি ও কলুষিত স্পর্শ হইতে মুক্ত থাকা চাই, নতুবা উহাদ্বারা আত্মিক অমঙ্গল হয়। এইজন্য রজঃস্বলা স্ত্রীলোকের স্পৃষ্ট অন্ন অখাদ্য। জ্ঞাতসারে অশুচি দ্রব্য সেবন করিবে না। অজ্ঞাতসারে যেসব অশুচিতা আসিয়াছে, তাহা নিবেদনের দ্বারাই দূর হইবে। আহার-কালে যথাসম্ভব মৌনী থাকাই কর্ত্তব্য এবং প্রতি গ্রাস অন্ন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ সঙ্কল্প করা বিধেয় যে, গৃহীত অন্ন হইতে সুবিশুদ্ধ বীর্য্যের এবং তল্লব্ধ বলের উৎপত্তি হইবে, তৎসহায়ে জগতের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে।

বিদেশে বা পরের বাড়ীতে থাকিয়া যাহাদিগকে বিদ্যার্জ্জন করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে আহারীয় সম্পর্কে খুঁটিনাটি নিয়ম পালন করিয়া চলা কঠিন ব্যাপার। সুতরাং ভগবানের মঙ্গলময় নামকে সর্ব্বশুচিপ্রদ জানিয়া তার দিকে তীব্র লক্ষ্য দিয়া চলা উচিত। শারীরিক শুচিতা বা আহার-শুদ্ধিকে উপলক্ষ্য করিয়া আবার শুচিবায়ুর না সৃষ্টি হয়। এই বুঝি অশুচি হইয়া গেলাম, এই বুঝি অশুচি খাদ্য খাইলাম, দিবারাত্রি এই জাতীয় দুশ্চিন্তা পোষণ করিয়া চলা হিতকর নহে, ইহা একপ্রকার মানসিক দুর্ব্বলতা বা ব্যাধি। এই দুর্ব্বলতাকে প্রভুত্ব করিতে দিবে না।

শুচিবায়ু

দুগ্ধ-ঘৃত, মাঠা-মাখন খাদ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দুগ্ধ ঘৃতাদি পাইলে আর মৎস্য-মাংস খাইবে না। মৎস্য-মাংস ব্যতীত উপায় না থাকিলে খাইও কিন্তু অতিরিক্ত মশলা ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ। পক্ষিমাংস বা ডিম্ব চিকিৎসকের বিশেষ উপদেশ ব্যতীত খাইবে না। অতিরিক্ত পরিমাণে ঝাল, অম্ল, লবণ ও সর্ষপাদি ত্যাগ করিবে। ঔষধের বা চিকিৎসকের প্রয়োজন ছাড়া পেঁয়াজ রসুন প্রভৃতি একেবারে অখাদ্য জানিবে,—কথিত হয় যে, ইহাদের গন্ধ পাইলে ব্রহ্মচর্য্য ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে। যাহা উগ্র এবং উত্তেজক, তাহাই

খাদ্য ও অখাদ্য

নিষিদ্ধ, যাহা স্নিগ্ধ এবং সহজ-পাচ্য, তাহাই সেব্য। আহারীয় দ্রব্যের পরিমাণ, প্রস্তুতি ও পরিবেশনের শুদ্ধতা, আহারীয় গ্রহণকালীন মনোভাব, এই সকলের উপরে আহারীয়ের শ্রেষ্ঠতা ও নিকৃষ্টতা নির্ভর করে।

হস্ত-পদ-মুখ প্রক্ষালিত না করিয়া ভোজনে বসিও না এবং প্রতি গ্রাস অন্ন বত্রিশবার চর্ব্বণ না করিয়া গলাধঃকরণ করিবে না। কারণ, পেটের ভিতরে দাঁত নাই, ভগবান্ মানুষের সবগুলি দাঁত তার মুখের মধ্যেই লাগাইয়া দিয়াছেন। প্রতি গ্রাস চর্ব্বণকালে ভগবানের নাম জপ করা বিশেষ প্রশংসার কথা।

বিনা ক্লেশে যাহা যথাকালে জীর্ণ হইয়া যায়, তাহার অতিরিক্ত ভোজন করিবে না। গুরুপাক দ্রব্য লঘুপাক দ্রব্যের অপেক্ষা অল্প পরিমাণে খাইবে। স্বাস্থ্যরক্ষা এবং কর্ম্মশক্তি বর্দ্ধনের জন্য যে আহার করিতেছ, এ কথা ভুলিয়া যাইও না। লোভের বশে বা জিদাজিদি করিয়া অতিরিক্ত আহার মূর্খতা মাত্র। বেশী খেতে করে আশা, তার নাম বুদ্ধিনাশা, আবার ভাতের সঙ্গে গোঁসা করিয়া উপবাস,—ইহাও বোকামি। মানসিক শক্তিবর্দ্ধন ও স্বাস্থ্য-সংশোধনের জন্য নিয়মানুগত উপবাস হিতকর।

নিজ নিজ কর্ম্মের প্রকৃতি বিচার করিয়া আহারের গুণ ও পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিবে। কঠোরশ্রমী লৌহশিল্পীর,

আহারীয় নির্ব্বাচন ও পরিমাণ

ফ্যাক্টরীর মজহুরদের, জাহাজের খালাসীর বা চাষী গৃহস্থের আহার্য্যের শ্রেণী বা পরিমাণ যাহা হইবে, ধ্যানপরায়ণ যোগীর, চিন্তাশীল দার্শনিকের, ধর্ম্ম-প্রচারক বা অধ্যাপকের আহার্য্যের শ্রেণী বা পরিমাণ তাহা হইতে পারে না। গৃহীর আর সন্ন্যাসীর জীবন-সাধনা এক নহে, এই জন্যই আহার্য্যও এক নহে। এমন কি, একজন আত্মমোক্ষপরায়ণ সন্ন্যাসী এবং একজন জগৎকল্যাণ-পরায়ণ সন্ন্যাসীর আহার্য্য বিভিন্ন প্রকৃতির। তামসিক কার্য্যে বা চিন্তায় যাহার দেহ ক্ষয় হয়, তাহার ত্রিগুণাত্মক দেহের তামসিক অংশই ক্ষয় পায়, সুতরাং ক্ষয়পূরণের জন্য তাহার পক্ষে তামসিক খাদ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উপযোগী, রাজসিক কর্ম্মীর জন্য রাজসিক আহারের প্রয়োজন; যোগী, ভক্ত বা বিদ্যার্থীর জন্য সাত্ত্বিক আহারের ব্যবস্থা। যখন যেরূপ আহারের প্রতি রুচি যাইতেছে," তোমার দেহ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেইরূপ কর্ম্মে ক্ষয়িত হইতেছিল এবং তোমার মন সেইরূপ চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হইতেছিল বলিয়া জানিও। আহারের রুচি কোন্ দিকে চলিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলেই তুমি তোমার অজ্ঞাত জীবনের সাত্ত্বিকতা, রাজসিকতা বা তামসিকতার খোঁজ কতকটা পাইবে।

ক্ষুধার সম্যক্ নিবৃত্তি হইবার পূর্ব্বেই পাত্রত্যাগ করিলে জঠরাগ্নি সর্ব্বদা প্রদীপ্ত থাকে বলিয়া স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা

দুরীভূত হয়। প্রবচন আছে,—"উণা ভাতে দুনা বল, অতি ভাতে রসাতল।" আহারের পূর্ব্বে এবং পরে প্রস্রাব করিবে। প্রস্রাবকালে সর্ব্বদা জল লইও। মলত্যাগের ন্যায় মূত্রত্যাগেও শৌচ আবশ্যক। মূত্রত্যাগের পরে জলশৌচ না করা অতিশয় ক্ষতিকর কদাচার। আচমন-কালে অতি উৎকৃষ্টভাবে মুখ মার্জ্জন করিবে। মুখগহ্বরের অপরিচ্ছন্নতা সর্ব্ব রোগের আকর।

পান খাইবে না। হরীতকী বা আমলকীই ব্রহ্মচারীর পক্ষে প্রশস্ত। "যস্য মাতা গৃহে নাস্তি, তস্য মাতা হরীতকী।"

মুখশুদ্ধি

ধূমপান করিবে না। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলিয়া রাখি যে, এসেন্স, পুষ্পসার, পমেটম, চা, জর্দ্দা, দোক্তা, নস্য প্রভৃতি অস্পৃশ্য জ্ঞান করিবে। শরীরে মনে পরিচ্ছন্ন থাকিবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাপড়ে বিলাসিতাও বর্জ্জনীয়।

"ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ।" বিদ্যালয়েও বহুভাষিতা পরিত্যাগ করিবে। যে সকল ছাত্রের নৈতিক চরিত্র দূষিত, তাহাদিগকে অব্যর্থ-দংশন ভুজঙ্গের ন্যায় দূরে পরিহার করিবে। যদি বুঝিতে পার যে, কোনও অসৎ ছেলে তোমার নৈতিক চরিত্রকে কলুষিত করিবার সুযোগ খুঁজিতেছে বা ফন্দি আঁটিতেছে, বেশী কথা বলিও না, সোজাসুজি তাহার নাকে-মুখে দশ ঘা লাথি মারিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দাও। লোকের কাছে তাহার নিন্দা করিয়া

দুষ্টদমন

বেড়াইও না। কারণ, তাহাতে তাহার সংশোধন হইবে না। তাহাকে যেখানে পাও, চিন্তাটুকু করিবার অবসর মাত্র না দিয়া ঘাড়ে ধরিয়া

বেশ করিয়া উত্তম-মধ্যম দক্ষিণা দিয়া দাও। নিজের শক্তিতে না পার, সংসাহসী ও চরিত্রবান্ অপরাপর যাহারা আছে, তাহাদের সহায়তা লও। দৃঢ় সঙ্কল্প রাখিবে, নৈতিক অপমান কখনও মাথা নত করিয়া সহ্য করিয়া যাইবে না। শত শত কিশোর ও যুবক এই সাহসটুকুর অভাবে চরিত্রের অমূল্য-সম্পদ হারাইতেছে এবং শত শত লম্পট পশু এই নীরবতার সুযোগ লইয়া নিজেদের পাশবিক বৃত্তির চরিতার্থতা করিতেছে। এই সব ভদ্রবেশধারী প্রচ্ছন্নচারী গুণ্ডার অত্যাচার দমনের জন্য ব্যায়াম কর, কুস্তি কর, লাঠিখেলা ও মুষ্টিযুদ্ধ শিখ, যত প্রকার সম্ভব দৈহিক শক্তি সঞ্চয় কর এবং শক্তি প্রয়োগের সকল কৌশলগুলি যত্নের সহিত আয়ত্ত কর, গ্রামে গ্রামে আজ ডনের আখ্ড়া স্থাপিত হউক এবং বলবীর্য্যশালী তেজস্বী ভারত-সন্তানগণের জয়োল্লাসমুখরিত কলহাস্যে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হউক। দুষ্ট-দমনে আজ তোমরা সমর্থ হও।

প্রকৃত শিক্ষক আজিকার দিনে দুর্লভ, অতি দুর্লভ। কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা শিক্ষক মহাশয়গণের ত্রুটী ধরিতে গিয়া গুরুনিন্দার পাপভাগী হইও না। শিক্ষক-দিগকে সম্মান করিবে, শ্রদ্ধা করিবে এবং সদ্ব্যবহার ও বিনয়ের প্রভাবে তাঁহাদের স্নেহ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইবে। হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ যদি তাঁহারা তোমাদের প্রতি স্নেহপরায়ণ না

গুরুনিন্দা বর্জ্জন

হন, তাহা হইলেও মনে মনে জানিও, তোমাদের মধ্যেই স্নেহ আকর্ষণের যোগ্যতার অভাব রহিয়াছে। বহুভাষিতা-শিক্ষা করিবার জন্য তুমি বিদ্যালয়ে যাও নাই, অতএব বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির শত প্রকারের অসম্পূর্ণতা থাকিলেও ইহার মধ্য দিয়া যতটুকু প্রেরণা লাভ তোমার পক্ষে সম্ভব, তাহার সবটুকু গ্রহণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিবে।

ছুটির দিনটা দিবানিদ্রা বা তাস-পাশা, প্রভৃতি আলস্যমূলক ক্রীড়ায় কাটাইয়া দিও না। দশজন বন্ধুবান্ধব মিলিয়া সাহিত্য চর্চ্চা কর। কি ভাবে তোমাদের প্রত্যেকের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের উদ্বোধন হইতে পারে, কি করিলে নিজেরা ঠিক ঠিক ব্রহ্মচারী হইতে পার এবং অপরাপরকে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি অনুরাগী করিতে পার, কি ভাবে ভারতের সুপ্ত যুবশক্তিকে জাগরিত করিয়া জাতীয় মঙ্গলে প্রেরণ করা যাইতে পারে, সতীর লাঞ্ছনা দূরীভূত হইতে পারে, দুর্ভিক্ষ শমিত হইতে পারে, দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া বসন্ত প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব কমিতে পারে, তদ্বিষয়ে আলোচনা কর। রবিবারের দ্বিপ্রহরটা এইভাবে আনন্দের মধ্য দিয়া সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য তোমরা প্রত্যেক পাড়ায় একটী করিয়া পবিত্রতা-প্রসারিণী-সমিতি বা সুনীতি-সঞ্চারিণী-সমিতি স্থাপন কর এবং উপযুক্ত কর্ম্মী ও সদাচারী ব্যক্তিকে পরিচালনার ভার দিয়া সর্ব্বপ্রকার

ছুটির দিনের কর্ত্তব্য

নেতৃত্বের লোভ

কল্যাণকর্ম্মে আদেশ-পালন করিবার যোগ্যতা সঞ্চয় করিতে চেষ্টা কর। দলাদলি করিতে গিয়া অথবা নিজে নেতা হইতে চাহিয়া এই নির্দ্দোষ আনন্দের কেন্দ্রটীকে ভাঙ্গিয়া দিও না। অপরকেই নেতা হইতে দাও, পরন্তু যে ভাবে পার, সবটুকু আনন্দ লুটিয়া লইবার জন্য সরল উদার চিত্তকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দাও এবং ঝগড়া-কলহের প্রবেশ-দুয়ার চিরতরে রুদ্ধ করিয়া দাও।

হাতের লেখা পত্রিকাতে সবাই মিলিয়া প্রবন্ধ লেখ, সাপ্তাহিক সম্মেলনে অনলবর্ষিণী বক্তৃতার অভ্যাস কর এবং ভবিষ্যদ্ জীবনে তোমরা প্রত্যেকেই যে রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ প্রভৃতির ন্যায় অথবা ততোধিক অমিত-

সমাজ-সেবার মহড়া

যশা সমাজ-সংস্কারক ও সমাজ-সংগঠক হইবে, তাহার মহড়া দিতে থাক। মনুষ্যত্বের পূর্ণতা-সাধনের জন্য একদিন হয়ত কত বিপৎ-সঙ্কুল, দুঃখবহুল, চিরবন্ধুর পথে তোমাদিগকে পাদ-চারণা করিতে হইবে, একদিন হয়ত কত অসাধ্যকে সাধিতে হইবে, একদিন হয়ত বজ্রাঘাতকে আশীর্ব্বাদ বলিয়া, মৃত্যুকে পুরস্কার বলিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিতে হইবে। কর্ম্মের দিক দিয়া আপাততঃ হউক আর না হউক, ভাবের দিক দিয়া তাহার জন্য আত্মপ্রস্তুতি তোমাদিগকে এখনই করিতে হইবে। জীবনকে যে সহস্রমুখ অভ্যুদয় দিতে হইবে, একথা কখনও যেন ভুলিও না।

অপরাহ্ণে স্কুলের খাটুনিতে (Task) মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করিও না। সময় এবং স্ফূর্ত্তি থাকে ত' একটু-আধটু লেখাপড়া করিতে পার, অবসাদ থাকিলে দরকার নাই। "মুড়ি আর ভুঁড়ি, দুই রোগের গুঁড়ি"—অর্থাৎ মাথা এবং পেট ঠাণ্ডা না রাখিলে সকল রোগই আক্রমণের সুযোগ পায়। অপরাহ্ণে খেলাধূলা, নদীতীরে বা খোলা মাঠে ভ্রমণ বা দীর্ঘপথ-পর্য্যটন, নির্দ্দোষ সঙ্গীত বা হাস্যালাপ ও সাধু-মহাপুরুষের সংসর্গ বিশেষভাবে অনুমোদনযোগ্য। যাহাদের দুই বেলা ব্যায়ামের অভ্যাস অথবা যাহারা প্রাতে ব্যায়াম করে না, তাহারা ব্যায়াম সূর্য্যাস্তের সাথে সাথেই সমাপ্ত করিবে। কারণ, সূর্য্যাস্তের পর স্নান করিলে কফ বর্দ্ধিত হয়।

অপরাহ্ণের কর্ত্তব্য

ব্যায়ামান্তর উপযুক্তকাল বিশ্রাম করিয়া স্নান করিবে অথবা ভিজা গামোছা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলিবে। মাথা ধোওয়া এবং প্রাতঃকালের ন্যায় চক্ষে জল দেওয়াও অতিশয় হিতকর।

সন্ধ্যাকালও প্রাতঃকালেরই ন্যায় ভগবদুপাসনার পক্ষে অতিশয় প্রশস্ত। উপাসনার জন্য একটি নির্দ্ধারিত স্থান ও একটি নির্দ্দিষ্ট আসন রাখিতে পারিলে ভাল। এই আসন পারতপক্ষে ধর্ম্মগুরু ভিন্ন অপরকে স্পর্শ করিতে দিবে না।

সমবেত উপাসনা ও কীর্ত্তন

প্রত্যহ পারিবে না, কিন্তু সপ্তাহে একদিন পাড়ার সমস্ত বালকেরা একত্র মিলিত হইয়া সমবেত উপাসনা ও কীর্ত্তন-যোগে ভগবানের গুণ-প্রশংসা এবং আরাধনা করিবে। যে পরমপ্রেমময় অখণ্ড-চৈতন্যের গুণ-বর্ণন হইতেছে, কীর্ত্তন-কালে তোমরা একমাত্র তাঁহাতেই সঙ্গীতযোগে ডুবিয়া থাকিতে চেষ্টা করিও। কীর্ত্তন বা ধর্ম্মসঙ্গীত যাহাতে তোমার ভাব-সমূহকে পরিপুষ্ট করে, তাহাই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং মহাজনপদের প্রত্যেকটী শব্দের অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য চেষ্টা করিও। পদকর্ত্তার রচনায় যদি কোনও অস্পষ্টতা বা অসম্পূর্ণতা থাকে, তোমার হৃদয় দিয়া তুমি তাহা পূর্ণ করিয়া লইও, এবং তোমার ধর্ম্মবিশ্বাস এবং সাধন-ধর্ম্মের অনুকূল ও প্রতিকূল ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইলে, তুমি তোমার ভাবের অনুকূল ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করিও এবং তাহারই রস-সম্ভোগ করিও। কীর্ত্তনকালে লাফালাফি বর্জ্জনীয়; কারণ, অধিকাংশ স্থলেই অতিরিক্ত অঙ্গচালনা ধ্যানাবেশের বিরোধী।

ভগবদ্বিষয়ক যে-কোনও সঙ্গীত বহুজনে মিলিয়া গান করা যায়, কীর্ত্তন বলিতে তাহাই বুঝিবে। রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব-বিষয়ক ব্যতীত অপর সঙ্গীত কীর্ত্তন নহে বলিয়া মনে করিও না। রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব না বুঝিয়া তদ্বিষয়ক কীর্ত্তনে ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার্থীর বিন্দুমাত্রও লাভ নাই। যে সঙ্গীতে তোমার নীচ প্রবৃত্তিগুলি ধুইয়া মুছিয়া দূর হইয়া যাইবে, সকল পাপের মালিন্য, সকল

কীর্ত্তন কাহাকে বলে?

কলুষ-কালিমা নাম-প্রবাহের তরঙ্গাভিঘাতে অতলে তলাইয়া যাইবে, যে সঙ্গীত তোমাকে ধর্ম্ম এবং কর্ম্মের সাধনায় প্রেরণা দিবে, স্বার্থান্ধ নয়নে দিব্য দৃষ্টি ফুটাইবে, সঙ্কীর্ণ হৃদয়কে প্রশস্ত করিবে, সঙ্কুচিত বক্ষকে উদার এবং সর্ব্বালিঙ্গনকারী করিবে, বিদ্বেষজর্জ্জর চিত্তে প্রেম দিবে এবং ঈর্ষ্যাজর্জ্জর অক্ষি-পল্লবে অশ্রুসিঞ্চন করিবে, তাহাই যথার্থ কীর্ত্তন। যে কীর্ত্তনে মনের সহিত প্রাণের যোগ বিভ্রষ্ট হয় না, ভাবের সহিত ভাষার বিচ্ছেদ রচিত হয় না, সুরের সহিত চিত্ত প্রশান্তির বিরোধ থাকে না এবং তালমানের সহিত রসাস্বাদনের দূরত্ব জন্মে না, তাহাই প্রকৃত কীর্ত্তন। যে কীর্ত্তনে মানুষ ভগবানের পানে ছুটিয়া যায়, আর ভগবান্ মানুষের পানে দু'বাহু প্রসারিয়া ছুটিয়া আসেন, সেই পরমরসাদ্র্র প্রাণমনোহারী কীর্ত্তনের আনন্দে নিজেকে বিকাইয়া দিও,— বৃথা রং-তামাসায় পরিণত করিয়া কীর্ত্তনের অলঙ্ঘনীয় মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিও না।

এতদ্ব্যতীত অপরাপর সময়েও সুযোগ পাইলে ভজন গান করিবে। ভগবানের নাম-যোগে ধ্রুপদ বা মালসী গান নিভৃত সাধকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সমভাবের ভাবুক একত্র মিলিত হইলেই ধ্রুপদ, মালসী বা কীর্ত্তন সর্ব্ববিধ সঙ্গীতেই প্রেমানন্দের উদয় হয়। যন্ত্রসঙ্গীত মনঃসংযোজনের পরম সহায়।

কীর্ত্তনে কুসঙ্গ

অতএব সুযোগ পাইলে স্বরদ, সুরবাহার, সেতার, এস্রাজ প্রভৃতিও অভ্যাস করিবে। কিন্তু পরকে শুনাইয়া বাহাদুরী নিবার লোভ থাকিলে এই উদ্দেশ্য অধিকাংশেই পণ্ড হইয়া যাইবে। সঙ্গীত শিক্ষার জন্য কোনও ক্রমেই কুলোকের সঙ্গ করিবে না, যথা-তথা যাইবে না, হাটে-বাজারে কীর্ত্তনাদি করিবে না, কুস্থান হইতে আনীত যন্ত্র স্পর্শও করিবে না বা ঐরূপ যন্ত্র-সহযোগে সঙ্গীত করিবে না। সঙ্গীত এদেশের শত সহস্র যুবকের মাথা খাইয়াছে, অতএব তোমাদিগকে একটু অতিরিক্ত মাত্রায়ই সতর্ক হইতে হইবে। ধর্ম্মলাভের অথবা নির্দ্দোষ আনন্দলাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত গান গাওয়া বা শুনা অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করিও। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মভাবের প্রসারসাধনের জন্য সঙ্গীতাভ্যাস প্রশংসনীয়।

উপাসনায় উৎসাহ দান

ছোট ছোট ভাই ভগ্নীগুলিকে তাহাদের মস্তিষ্কের গঠনানুরূপ ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত এবং উপাসনায় উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিবে। বন্ধুবান্ধবগণ এবং তোমার পরবর্ত্তী ছাত্রসমাজের মধ্যে এই মহাভাবের বন্যা আনয়ন করিতে কখনও চেষ্টার শৈথিল্য করিবে না। কামাতুরতা যাহাদিগকে হতাশ, দুর্ব্বল ও অবিশ্বাসী করিয়াছে, অসংযম যাহাদের মস্তিষ্ক, স্নায়ু ও মাংসপেশী রাক্ষসের মত কাঁচা চিবাইয়া খাইয়াছে, জীবনী-শক্তি হারাইয়া যাহারা সাহস, বল, বীরত্ব ও মনুষ্যত্বে বঞ্চিত

হইয়া হতভাগ্যের ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছে, ইন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক উত্তেজনায় যাহারা কাতর হইয়া পড়িয়াছে, অজ্ঞাতসারে উপর্য্যুপরি বীর্য্যক্ষয়-হেতু যাহারা জীবন অপেক্ষা মরণ অধিকতর কাম্য বলিয়া মনে করিতেছে, যাহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম অবাধ্য, অকর্ম্মণ্য এবং চিত্তবৃত্তিগুলি বিমুখ এবং বিকৃত, উপাসনাই তাহাদের ত্রিজগতে একমাত্র বন্ধু, উপাসনাই তাহাদের পতিত জীবনের পরমপাবনী মহাশক্তি। উপাসনা তাহাদের রোগজর্জ্জর দুর্ব্বল দেহকে সুস্থ করিবে, তাহাদের অবশ মনে অসীম-শক্তির সঞ্চার করিবে।

যাহারা মহাপুরুষের কৃপাপ্রাপ্ত, তাহারা যে-ধর্ম্মাবলম্বীই হউক না কেন, তাহাদের জন্য অতিরিক্ত কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি।

ইষ্টমন্ত্র জগতের সর্ব্বমন্ত্রসার,—
একমাত্র ইষ্টমন্ত্রে জগৎ-উদ্ধার।
দেহ, মন, মেধা, বুদ্ধি, চিত্ত, আত্মা, প্রাণ,
একমাত্র ইষ্টনামে সবার কল্যাণ।

তথাহি,

নামেতে কল্যাণচয় রহে লুকাইয়া,
লাভ কর সে কল্যাণ সাধন করিয়া।

পরন্তু,

অল্প করিয়াও যদি জপ কর প্রতিদিন,
উন্মেষিবে ব্রহ্মতেজ আসিবে সুদিন।
একদিন দিবারাত্তি একদিন বাদ,
কম লাভ তাহে কিন্তু বেশী অবসাদ।

কিন্তু উপাসনা যথাসম্ভব বাহ্য-আড়ম্বরহীন এবং ধর্ম্মজীবন বাক্য-আড়ম্বরহীন হওয়া প্রয়োজন। তুমি যে একজন বড় ভক্ত বা দারুণ সাধক, একথা লোক-সমাজে জাহির করিবার

দুষ্প্রবৃত্তিকে দমন করিতে হইবে। দদ্রুর যেমন
ভাণ কণ্ডূয়ন আছে, নিজেকে সাধক বলিয়া প্রচার
করিবার প্রবৃত্তিও তেমন একটা অতি কদর্য্য কণ্ডূয়ন আছে। ইহা দমন করিয়া চলিতে হইবে। যে-কোনও প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানেরই হউক না কেন, আড়ম্বর সর্ব্বদা বর্জ্জন করিবে। ভক্তি ও ধার্ম্মিকতার ভাণ সর্ব্বদাই ক্ষতিকর।

তপস্যা-বিহীন বাক্য-আড়ম্বরে,
নাহিক কল্যাণ বৃথা কর্ম্ম বাড়ে।

সাধনা যতই নিবিড় হইবে, গভীর হইবে, গোপন হইবে, ততই পরমানন্দের উৎস খুলিয়া যাইবে। তাই—

বহিরঙ্গ কীর্ত্তনের করি' অবসান
মহামন্ত্রে প্রাণযজ্ঞে কর আত্মদান।

ভগবানের নামের বলেই তোমার ইচ্ছার মধ্যে জগৎ-কল্যাণের অসীম-সামর্থ্যের সমাবেশ হইবে। কেননা, তিনিই যাবতীয় জগৎকল্যাণের মূলীভূত উৎস, এবং ব্রহ্মাণ্ডের সকল তেজ, সকল বীর্য্য, সকল শক্তি তাঁহারই চরণ-কোণ হইতে বিচ্ছুরিত হয়।

মহামন্ত্র জপি' দিবস রজনী,
পদানত কর বিপুলা ধরণী।

নিষ্কাম প্রেরণা হয়না নিষ্ফল,
বিশ্ব-শুভেচ্ছায় জাগে ব্রহ্মবল।
মহানাম-যোগে বিশ্বের বিকাশ,
নাম-বলে বিশ্ব হবে ব্রহ্মদাস।

নীরবতার মধ্য দিয়াই সাধনের অব্যর্থ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয় এবং সাধকের মৌন ইচ্ছা সমগ্র মানব-সমাজের মনের উপর নিজ প্রতিষ্ঠা গড়িয়া লয়। নীরব, নিভৃত, গোপন কল্যাণৈষণা সকলের অজ্ঞাতসারে উপযুক্ত আধার-সমূহে নব-ভাবের উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়া অলসকে উৎসাহবান্ ও শিথিলকে দৃঢ়কর্ম্মা করিয়া তোলে।

মৌনসিদ্ধ ব্রহ্মবীর্য্যে কর্ম্মের উচ্ছ্বাস,
বাক্যযোগে উপদেশ ব্যর্থ বহুভাষ।

কিন্তু আচার্য্য কর্ত্তৃক যতটুকু উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা নির্ভুলরূপে এবং ধারাবাহিকভাবে সম্পাদিত হওয়া চাই,—

নির্ভুল সাধনে হয় নির্ভুল কল্যাণচয়,
অখণ্ড-সাধনে প্রেম অখণ্ড-জীবনময়।

আরও চাহি ভগবদ্ভক্তি ও নির্ভর। ভগবান্কেই পরম-গুরু জানিয়া, ভগবান্কেই পন্থা-প্রদর্শক জানিয়া, ভগবান্কেই জীবন-সমুদ্রের কাণ্ডারী জানিয়া, তাঁহার উপর নিয়ত নির্ভর করিবে। তাঁহাকেই জানিবে সখা, তাঁহাকেই জানিবে গুরু। তাঁহার নামকে জানিবে তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার বিভূতি তাঁহার

ভগবদ্ভক্তি ও নির্ভর

প্রতিমূর্ত্তি। "জয়গুরু-শ্রীগুরু" বলিয়া নিয়ত নিজেকে তাঁহারই পদতলে দিবে উপঢৌকন, আর, তাঁহার ত্রিলোকবিজয়ী পরমপাবন মহানাম স্মরণ করিয়া নিয়ত করিবে আত্মজয়।

শ্রীগুরু-নির্ভরে শ্রীনাম উজ্জ্বল,
শ্রীনাম-নির্ভরে বুকভরা বল।

রাত্রির আহার লঘু হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ গুরুজন ব্যতীত, অর্থাৎ যাঁহাদের পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদরূপে গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ হইবে না, এমন ব্যক্তি ব্যতীত, অপরের উচ্ছিষ্ট সেবন অসঙ্গত। রুগ্ন, ক্রুদ্ধ, কামুক, কদাচারী ও কদাহারী ব্যক্তির ভুক্তাবশিষ্ট বর্জ্জন করিবে। দেশে অপরের উচ্ছিষ্টকে প্রসাদরূপে গ্রহণের রীতি আছে বটে, কিন্তু এই রীতি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের বিরোধী।

উচ্ছিষ্ট ও প্রসাদ

রাত্রিতে দেড় প্রহরের অধিক জাগরণ হিতজনক নহে। আগরাত্রিতে অর্থাৎ রাত্রি নয়টার পর হইতে নিদ্রা এবং শেষ রাত্রিতে জাগরণ ব্রহ্মচারীর পক্ষে বিশেষভাবে প্রশস্ত। শয়নের পূর্ব্বে এক গ্লাস শীতল জল পান করিয়া প্রার্থনা করিতে করিতে নিদ্রিত হইবে। নিদ্রার প্রাক্কালে যাহারা ঈশ্বর-চিন্তন করে, নিদ্রাকালেই তাহাদের মন অজ্ঞাতসারে সাত্ত্বিক গঠন অর্জ্জন করিতে থাকে। শেষ রাত্রিতে যাহারা পড়িয়া ঘুমায়, নিদ্রাযোগে বীর্য্যক্ষয়

নিদ্রা ও জাগরণ

তাহাদেরই বেশী হয়। সারা বৎসরই শেষ রাত্রে উঠিয়া অধ্যয়নের রীতি প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। ইহাতে শরীর খারাপ হইবে, এমন কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা না জানিয়া বলেন। শেষরাত্রের পড়াশুনা যেমন মনে থাকে, এমন আর কোন সময়েই হয় না। ফলে অল্প সময়ে অল্প শ্রমে বেশী শিক্ষা করা যায়। এই সময়ে যাঁহারা শ্রীভগবানের নামের সেবা করেন, তাঁহারা অতি ভাগ্যবান্। প্রথম প্রথম শেষ রাত্রিতে জাগিলে অনভ্যস্ত শরীর একটু ক্লিষ্ট ও রুক্ষ বোধ হয়। এমতাবস্থায় তিল তৈল মস্তকে ব্যবহার করিবে এবং প্রত্যহ স্নানের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে বিশেষ ভাবে পদতলে ও বক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ভাবে খাঁটি সর্ষপ তৈল মর্দ্দন করিবে। শেষরাত্রে জাগরণ-অভ্যাসীর পক্ষে প্রাতঃস্নান যেমনই হিতকর, তেমনই আরামপ্রদ। কিন্তু প্রাতঃস্নানাভ্যাসীর পক্ষে দ্বিপ্রহরে কিম্বা সন্ধ্যাকালে স্নান অথবা অন্ততঃপক্ষে মাথাধোয়া ও ভিজা গামোছা দ্বারা গাত্রমার্জ্জন আবশ্যক, নতুবা শরীর কৃশ হইয়া যাইতে পারে।

রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বেই সংক্ষেপে দিনলিপি (ডাইরী) লিখিবে। শয়নের পূর্ব্বে দিনলিপি লিখিতে গেলে কাহারও কাহারও পক্ষে অনিষ্ট হয়। শয়নের পূর্ব্বে দিবসের সকল

দিনলিপি

দুষ্কৃতির কথা স্মরণ করিবার পরে অনেক দুর্ব্বল-চেতার মন থেকে নিদ্রাকালেও সে সব চিন্তা দূর হয় না। তাহাদের পক্ষে পরদিবস প্রাতঃকালে

দিনলিপি লিখা কর্ত্তব্য। দিনলিপি লিখিতে কখনও তোমার চরিত্রের কোনও অংশ গোপন করিবে না বা মিথ্যা লিখিবে না।* ইহা কখনও অনবধানে যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখিবে না বা কোনও বাজে লোককে দেখিতে দিবে না। জীবনের কোনও গোপন কথাই কোনও নিন্দুক লোককে জানিতে দিবে না। যাঁহারা তোমাকে পাপী বলিয়া ঘৃণা করেন না, পতিত বলিয়া উপেক্ষা করেন না, অক্ষম বলিয়া নিন্দা করেন না বা লোক-দৃষ্টিতে তোমাকে খাটো করিয়া দিবার জন্য অণুমাত্রও আগ্রহ প্রকাশ করেন না পরন্তু তোমাকে উন্নতি-পথাবলম্বী করিবার জন্য যিনি অকপট চিত্তে, প্রাণপণ আগ্রহে ও আবেগে সুকঠোর শ্রম স্বীকার করিতেও অকুণ্ঠিত, এমন মহাপ্রাণ, সর্ব্বজীব হিতৈষী, লোককল্যাণকারী কোনও চরিত্রবান

আত্ম-বিশ্লেষণ

পুরুষকে মাঝে মাঝে এই দিনলিপি দেখাইয়া জীবন-গঠন বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ, উৎসাহ ও প্রেরণা গ্রহণ করিবে। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে বসিয়া

---

* দিনলিপি লিখিতে বিশেষ কতকগুলি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এইজন্য অযাচক আশ্রম হইতে "দিনলিপি বা দৈনিক আত্মশোধন" নামে এক প্রকারের ডাইরি প্রকাশিত রহিয়াছে। উহা এমন ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে যেন "ডাইরী"র জন্য পৃথক্ খাতা প্রস্তুত না করিয়া শুধু প্রত্যেক প্রশ্নের সম্মুখে 'হাঁ' ও 'না' লিখিলেই চলিতে পারে। ঐ গ্রন্থে অনেক মূল্যবান্ উপদেশও সংযোজিত হইয়াছে। একখানা দিনলিপিতে কয়েক মাস চলে।

অতীত দিনগুলির সহিত বর্ত্তমান দিনগুলির তুলনা-মূলক আলোচনা করিবে এবং যদি অবনত হইতেছ বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে হতাশ না হইয়া উন্নত হইবার জন্য নূতন সঙ্কল্প করিবে। আর উন্নত হইতেছ বলিয়া যদি ধারণা জন্মে, তাহা হইলে আরও উন্নতি লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইবে। এই প্রসঙ্গে একটী কথা বলিয়া রাখি যে, যাহারা হতাশা দেয়, উৎসাহ দিতে জানে না, মন্দ দিকটার প্রতিই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে, ভাল দিকটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে শিখে নাই, ভয় দেখাইতেই পারে, সান্ত্বনা বা সাহস দিতে পারে না, তাহাদের সঙ্গ সর্ব্বথা পরিহার করিবে। তোমাদের জীবনের দুঃখ-দুর্গতি সব কিছু সম্যক্ জানিয়াও যাহারা কেবল আশার বীণারই ঝঙ্কার দেয়, প্রাণে উৎসাহেরই সঞ্চার করে, "পড়িতে পড়িতেও তোমরা উঠিয়া দাঁড়াইবে, মরিতে মরিতেও তোমরা বাঁচিয়া উঠিবে, তোমাদের ধ্বংস নাই, মৃত্যু নাই, পতন নাই, অমৃতের তোমরা পুত্র, অমরত্বের তোমরা অধিকারী, দিব্যবীর্য্যে তোমাদের জন্ম"— এই আশ্বাসের বাণীই যাহারা নিয়ত শুনায় এবং সঙ্কল্প রক্ষার অনুকূল উপদেশ যাহারা দেয়, তাহাদিগকে জীবনের সখা বলিয়া জানিও।

একাকী এবং কঠিন শয্যায় শয়ন করিবে। অপরের সহিত এক শয্যা ব্যবহার করা না

কোমল শয্যায় শয়ন করা, আর নিজের সহিত নিজে শত্রুতা সাধন করা একই কথা। কোলবালিশ সদ্যঃ সংযমনাশক। বেশী উচ্চ বালিশে শয়ন করিলে নাশিকা বক্রাকৃতি হইয়া যায়। বামদিকে কাৎ হইয়া শুইলে হৃৎপিণ্ডের কিঞ্চিৎ ক্রিয়াবৈষম্য ঘটে। আবার দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে যকৃতের ক্রিয়াবিকৃতি হয়। চিৎ হইয়া ঘুমাইলে শ্বাসকার্য্যের ব্যাঘাত হয় এবং ব্রহ্মচর্য্যেরও বিশেষ ক্ষতি সাধিত হয়, কারণ, মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্ত হইতে অসংখ্য রতিস্নায়ু চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া যাবতীয় জনন-সম্পর্কিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির সহিত যুক্ত হইয়াছে,—চিৎ হইয়া শুইলে এই স্নায়ুসমূহ উষ্ণতাপ্রযুক্ত উত্তেজিত হইয়া অনর্থ সম্পাদন করে। আবার উপুড় হইয়া ঘুমাইলেও জননেন্দ্রিয়ের সহিত শয্যার সংস্পর্শে লৈঙ্গিক উত্তেজনা জন্মিতে পারে এবং অজ্ঞাতসারে কামভাব উদ্রিক্ত এবং বীর্য্য স্খলিত হইতে পারে। এইজন্যই মহর্ষি চরক বসিয়া ঘুমাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু সকলের পক্ষে এইরূপ অভ্যাস সঙ্গত হইবে না। সুতরাং

শয়ন

সাধারণতঃ শয়ন করিতে বাম পার্শ্ব লইবে। যাহাদের হৃৎপিণ্ডে কোনও ব্যাধি আছে, তাহারা দক্ষিণ পার্শ্বেই শয়ন করিবে, কিন্তু আহারের অব্যবহিত পরেই দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে অজীর্ণ রোগ জন্মে। আহারের পর পনের মিনিট কাল বিশ্রাম এবং পাঁচ মিনিট কাল পায়চারী করিবে।

আহারের পূর্ব্বে মলাধার এবং শয়নের পূর্ব্বে মূত্রাধার খালি করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা স্বপ্নস্খলনাদি উপদ্রবের প্রচুর সম্ভাবনা। শয়নের পূর্ব্বে এক গ্লাস শীতল জল পান করিবে এবং নিদ্রাবস্থায়ও তোমার মন যেন শুধু ভগবৎ-সম্বন্ধীয় পবিত্র বিষয়েরই অনুশীলন ও অনুকরণ করিতে থাকে, বারংবার এইরূপ সঙ্কল্প করিবে। সরল মেরুদণ্ডে আসন করিয়া বসিয়া একুশবার অশ্বিনী বা যোনিমুদ্রা করতঃ নিদ্রা না আসা পর্য্যন্ত নাম জপ করিবে। কখনও কুকুর-কুণ্ডলী হইয়া ঘুমাইও না, সোজা সরল ভাবে শয়ন করিবে; নতুবা দেহের গঠন খারাপ হইয়া যায়।

স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব

স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব রক্ষা করিবে। স্ত্রীলোক দেখিবামাত্র "জয় মা" "জয় মা" বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিবে এবং তুমি যেন তাঁহার কোলের শিশু, তাঁহার স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়াই যেন তোমার দেহ পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাঁহার স্নেহ-আদরের মধ্য দিয়াই তোমার মনুষ্যত্ব পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে, এইরূপ সকৃতজ্ঞ সন্তানভাব মনে মনে পোষণ করিবে। স্ত্রীলোকের মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে মনে মনে ভাবিতে আরম্ভ করিবে, ইহা যেন তোমার মায়ের মুখ, স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করিলে চিন্তা করিবে, ইহা তোমার মায়ের কণ্ঠস্বর, এবং "যা দেবী সর্ব্বভুতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ”
বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবে। বালিকা বা তোমার মায়ের চাইতে অল্পবয়স্কা কোনও রমণীর প্রতি দৃষ্টি পড়িলে ভাবিতে থাকিবে,—“একদিন আমার মা এইরূপ ছিলেন”, মায়ের সমবয়সিনী কাহারও প্রতি দৃষ্টি পড়িলে ভাবিতে থাকিবে,—“আমার মাও ত' ইহারই মতন”, মায়ের অপেক্ষা বর্ষীয়সী নারীর উপরে দৃষ্টি পড়িলে মনে মনে ভাবনা করিবে,—“এক দিন আমার মা এইরূপ হইবেন।” স্ত্রীলোকের প্রতি লক্ষ্য পড়িবামাত্র বজ্রগর্জ্জনে গাহিতে থাকিবে “বন্দে মাতরম্” এবং মনে মনে ভাবিতে থাকিবে আদ্যাশক্তি ভগবতী তোমার জননী, বীর-প্রসবিনী ভারতভূমি তোমার জননী, রমণী-বিগ্রহ-ধারিণী মাত্রেই তোমার জননী, সতী সাবিত্রীও তোমার জননী, কলঙ্কিনী কুলটাও তোমার জননী—তোমার জননী সবাই, তুমি সকলেরই সন্তান। স্ত্রীলোক দর্শনে যদি তাঁহার প্রতি ভোগভাব জন্মে, তবে জানিও, জাহান্নমে ডুবিবার আর দেরী নাই। ব্যক্তিগতভাবে তোমার নিজের হয়ত ভোগবুদ্ধি তাঁহার দিকে ধাবিত হয় নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তোমার মনে যদি জাগে যে, ইনি অমুকের ভোগ্যা, তবেই সর্ব্বনাশ। তোমাকে ভাবিতে হইবে, ইনি অমুকের মা, অমুকের মাসীমা, অমুকের খুড়ীমা, অমুকের জেঠিমা বা অমুকের পিসীমা—এইভাবে। ভাবিবে না,—ইনি কাহারও স্ত্রী, পরন্তু ভাবিতে হইবে,

তুমি আমারই মত কাহারও মাতা বা মাতৃস্থানীয়া, ভাবিতে হইবে—আমারই মত কোন সন্তান ইঁহার অমৃতময় স্তন্যরস পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে, ভবিষ্যৎ ভারতের কোনও বজ্রনির্ঘোষকারী বীর সন্তান হয়ত ইঁহারই অফুরন্ত স্নেহের শক্তিতে দিনের পর দিন প্রবর্দ্ধিত হইতেছে, একটা সমাজের, একটা জাতির, একটা দেশের চরণের লৌহ-শৃঙ্খল যাহারা চূর্ণ করে, তাহাদের কেহ হয়ত ইঁহারই ক্রোড়ে আজ নাচিতেছে, খেলিতেছে আর 'মা' ডাক শিখিতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনে কোনও অপবিত্র ভাব উদিত হওয়া মাত্র বীর্য্য স্থানভ্রষ্ট হয় এবং শুক্রকোষে উপযুক্ত পরিমাণে আসিয়া জমা হইলেই নিদ্রাযোগে বহির্গত হইয়া যায়। সুতরাং কুদৃশ্য দর্শন করিবে না, কুকথা বলিবে না বা শুনিবে না, কুবিষয়ের চিন্তা করিবে না। সংসঙ্গে অবস্থান, সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন, ব্যসন-বিলাস বর্জ্জন, পবিত্র পরিমিত আহার, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সর্ব্বদা উন্নত কার্য্যে লিপ্ত থাকা এবং ভগবানে আত্মসমর্পণ প্রভৃতির দ্বারা অধ্যবসায় সহকারে নিজেকে দিনের পর দিন অসীম যত্নে গঠন করিতে থাক। আত্মগঠনের পথে মাঝে মাঝে যদি নিদ্রা-স্খলনের দ্বারা পীড়িত হও, তথাপি হতাশ হইও না। এজগতে চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। উপযুক্ত চেষ্টা করিলে উপযুক্ত সাফল্য আসিবেই। নিত্য ব্যায়াম ও নিত্য উপাসনা

নির্ভর কর
নির্ভয় হও

শত শত হতভাগ্যকে রক্ষা করিয়াছে, তোমাদিগকেও করিবে। **নির্ভর কর, নির্ভয় হও।** নিদ্রিতাবস্থায় বীর্য্যস্খলন হইলে গাত্রোত্থান করিয়া পুরুষেন্দ্রিয় ও অণ্ডকোষ শীতল জল

দ্বারা ধৌত করিয়া ফেলিবে এবং মূত্রত্যাগান্তে

শুক্রক্ষয় হইলে একগ্লাস শীতল জল পান করিয়া ভগবানের

কি কর্ত্তব্য নাম করিতে করিতে পুনরায় নিদ্রিত হইবে।

বীর্য্যস্খলনের পর অর্দ্ধঘন্টাকাল ঘুমাইলেও

তাহা দ্বারা উপকার হয়। উপকার আরও অধিক হয় যদি এই নিদ্রাটী অবসন্নতা-প্রযুক্ত না হইয়া নাম-সেবার ফলস্বরূপে হয়। তৎপর নিদ্রাভঙ্গে উৎকৃষ্ট ভাবে সর্ব্বাঙ্গে তৈলাভ্যঙ্গ করিয়া স্নান করিবে এবং স্নানানন্তর শক্তিস্বরূপ শ্রীভগবানের নিকট বীর্য্যধারণের শক্তি আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিবে। যোনিমুদ্রা * সহযোগে ভ্রূমধ্যে মনঃস্থির করিয়া সেই স্থানে পরমপুরুষের ধ্যান বিশেষ হিতকর। বীর্য্যক্ষয়ের পর ছয় ঘন্টার মধ্যে ব্যায়াম, সঙ্গীত, দূরপথ ভ্রমণ বা কঠোর শ্রমজনক কোনও কার্য্য করিবে না। মহর্ষি মনু এইরূপ বীর্য্যক্ষয়ের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গায়ত্রী জপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তোমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা-কালে গায়ত্রী বা গুরুদত্ত মহানাম

---

* যোনিমুদ্রা প্রভৃতি ব্রহ্মচর্য্য-সহায়ক প্রতিক্রিয়াগুলি গ্রন্থকার-প্রণীত "সংযম সাধনা" পুস্তকে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া এখানে পুনরুল্লিখিত হইল না।

জপ করিও। কামচিন্তা ও সর্ব্বপ্রকার উত্তেজনার হ্রাস করিতে নাম-জপের ন্যায় শ্রেষ্ঠ উপায় এ জগতে আর কি আছে।

নামের শক্তি

নামে নির্ভর করিও। যতই ব্যতিব্যস্ত হও না কেন, নামই সকল-বিপদ-ভঞ্জন। উৎপাত যতই বাড়িবে, তুমিও নামে তত অধিক লাগিয়া থাকিবে। সদর্পে গাহিবে,—

আসুক গভীরা রজনী,—আমি ভয় ত' করি না তারে;
নাম যে আমার পরম সঙ্গী, জপিব তা' বারে বারে।
শশী-তারা সব যাক না নিভিয়া, বিন্দু ব্যথিত হবে না এ হিয়া;
তিমির-তারণ মোহ-নিবারণ নামটী ছাড়িব না রে!
বহুক ঝটিকা ক্ষিপ্ত আবেগে, নামেতে চিত্ত রবে আরো লেগে;
নাম যে আমার শিরের ছত্র বরষার শত ধারে।
শুনাইবে নাম নির্ভয় বাণী, শঙ্কাবিহীন করিবে পরাণি,
জীর্ণ ভেলায় ক'রে দেবে পার উর্ম্মিল পারাবারে। *

নামে নির্ভর করিও, দেখিও তমসাবৃত অমাবস্যার রাত্রিতেও তোমার জন্য পূর্ণিমার চাঁদ উঠিতেছে, মরুভূমির বুক চিরিয়াও তোমার জন্য সুশীতল বারি-নির্ঝর বাহিরিয়া আসিয়াছে। একাগ্রচিত্তে নাম-সাধনা করিতে থাক, দেখিবে, ইহার ফলে এমন অসম্ভবও সম্ভব হইবে বীর্য্যধারণ যাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ কথা।

* বেহাগ, একতালা।

শুষ্ক তরু মুঞ্জরিবে নামের কৃপাগুণে
(ওরে তুই) ভয় ভাবনায় হ'স্ নে অধীর অবিশ্বাসীর দ্বন্দ্ব শুনে ॥
যত সব ঝরা পাতা
চোখের জলে ভিজে দেবে মাটির উর্ব্বরতা,
উঠ্‌বে বেঁচে মরা-শিকড় রসের আস্বাদনে ॥
বৃক্ষমূলে রসের যদি হয়রে পরশন,
তরু কি আর নীরস থাকে ? পত্র-পুষ্প লাখে লাখে
চতুর্দ্দিকে মোহন শোভা করবে বিকিরণ।
নামেই আজ কর ভরসা, বন্ধু কে আর তিন ভুবনে ?

নামজপ ব্রহ্মচর্য্যের পরম সহায়। যাহারা অন্য নাম জপ করে না, তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র নামজপের এক অত্যুৎকৃষ্ট অবলম্বন। যাহারা জপেচ্ছুক, তাহাদের জন্য নিম্নে গায়ত্রী ও তাহার ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ হইল।

গায়ত্রী :— ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

ব্রহ্মগায়ত্রীর ব্যাখ্যা :—ওঁ (ব্রহ্ম) ভূঃ ভুবঃ স্বঃ (স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই তিন লোক, অথবা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ, অথবা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিনকাল) তৎসবিতুঃ * (এই ত্রিলোকের, এই ত্রিগুণের অথবা এই ত্রিকালের প্রসবকারীর অর্থাৎ সৃষ্টিকারী ব্রহ্মের) বরেণ্যং ভর্গো (শ্রেষ্ঠ স্বতঃ-প্রকাশ তেজ) দেবস্য (দেবের অর্থাৎ ত্রিজগৎ, ত্রিগুণ ও ত্রিকাল সৃষ্টিকারী স্বয়ংদীপ্ত পরমব্রহ্মের) ধীমহি (ধ্যান

---

* "যশ্চরাচরং জগৎ সুনোতি সূতে ব্যুৎপাদয়তি স সবিতা পরমেশ্বরঃ।"

করিতেছি) ধিয়ো (বিবেক অথবা বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ) য়ো (যিনি) নঃ (আমাদের) প্রচোদয়াৎ (প্রেরণ করিতেছেন) ওঁ (ব্রহ্ম)। অর্থাৎ —যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি-সমূহকে প্রেরণ করেন, সেই ত্রিলোক-প্রসবিতা ত্রিগুণশ্রষ্টা, ত্রিকালস্থজনকারী পরব্রহ্মের শ্রেষ্ঠঃ স্বতঃপ্রকাশ তেজের ধ্যান করি।

যাহারা অন্য মন্ত্র জপ করে, তাহারা ইষ্টমন্ত্র জপ করিবার পূর্ব্বে তিনবার অথবা দ্বাদশবার ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবে। গায়ত্রী জপকালে মনে মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে যে তুমি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতেছ, ব্রহ্মতেজ তোমার মধ্যে স্ফুরিত হইতেছে ; ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি ও বিশ্বামিত্রাদি তপঃসিদ্ধ ঋষিদিগের সামর্থ্য তোমার মধ্যে পুঞ্জীভূত হইতেছে। ব্রহ্ম-গায়ত্রী সকল যুগের, সকল জীবের সমুন্নতিসাধক, পরমাভ্যুদয়-প্রদায়ক, সুমঙ্গলবিধায়ক নিত্যামোঘ মহামন্ত্র। এই মহামন্ত্র ম্লেচ্ছের ম্লেচ্ছত্ব বিদূরণ করে, মহাপাপীর পাপ নাশ করে।

ব্রহ্মগায়ত্রী

ইহার সাধনার মধ্য দিয়া অতীত ভারত ঐক্যের মহাশক্তিকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, ভাবী ভারতও ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রের মধ্য দিয়াই সকলকে ব্রাহ্মণে পরিণত করিয়া অভাবনীয় ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করিবেন। গায়ত্রী যে-কোনও জাতির ঔরসে বা গর্ভে জাত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণে পরিণত করিয়া তাহার জন্মকর্ম্ম সার্থক করিয়া দিতে সমর্থ। অতীতে এই ব্রহ্মগায়ত্রীর মহাবলেই ভারতীয় আর্য্য-জাতি পৃথিবীর সকল অনার্য্যকে টানিয়া আনিয়া আর্য্য করিয়াছিলেন, ইহারই সম্পর্কে উদারতার

অভাব ঘটিয়া যাওয়াতে সমগ্র ধরণী অনার্য্যে হইয়া গেল পরিপূর্ণ, আবার ইহারই মহিমায় নিখিল ভুবন পরিত্রাণ পাইবে, ব্রাহ্মণ হইবে, হিংসাদ্বেষের মূলোৎপাটন করিবে।

ব্রাহ্মণত্বের অধিকার

ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে যে পার্থক্যের প্রাচীর সমুন্নত শিরে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে ভূতলশায়ী করিবার জন্য কতজনে কত চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু মনুষ্যমাত্রকেই ব্রাহ্মণের সাধনায় ব্রতী করিতে অতি অল্প জনেই আগ্রহী হইয়াছেন। এমন কি, দেখা গিয়াছে যে, কত ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ্যগর্ব্বী হইয়াও গায়ত্রী জপে না, গায়ত্রীর মানে জানে না, ইহার প্রভাব, তাৎপর্য্য এবং মহিমা বোঝে না। ফলে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে তিক্ততা বাড়িয়াছে, মনুষ্যত্বের মান কাহারও বাড়ে নাই। মানুষ শুধুই মানুষ নহে, পরিপূর্ণ ব্রাহ্মণত্বের উৎকৃষ্টতম বিকাশ-সম্ভাবনার সে এক অপূর্ব্ব আধার। মানুষের মত হাত-পা-চখ-নাক-কাণ পাইয়াছ বলিয়াই তুমি গৌরবী নহ, ব্রাহ্মণের চূড়ান্ত যোগ্যতা আহরণ জাতি-জন্ম-কুল-নির্ব্বিশেষে তোমার পক্ষেও সম্ভব বলিয়াই তোমার মনুষ্য-জন্ম ধন্য ও মহৎ।

শক্তির উৎস

বেদশাস্ত্রের শক্তির উৎস ব্রহ্মগায়ত্রী, ব্রহ্মগায়ত্রীর শক্তির উৎস ওঙ্কার, ওঙ্কারের শক্তির উৎস তাঁহার সর্ব্ব-মন্ত্র, সর্ব্ব-তত্ত্ব, সর্ব্বপথের স্বীকৃতি। ওঙ্কার-মন্ত্র কোনও মতপথের সহিত বিগ্রহ করে না, কোনও মত-পথের প্রতি তাহার নিগ্রহ নাই,

যে-কোনও মত বা পথকে স্নেহের দৃষ্টিতে সহিয়া যাইবার ক্ষমতা সে রাখে, তাই ওঙ্কারের ভিতরে সাম্প্রদায়িক উগ্রতা ও সাম্প্রদায়িকতার তিক্ততা নাই। এই জন্যই ওঙ্কার ও ব্রহ্মগায়ত্রী কোটি কোটি অনার্য্য দ্বারা অধ্যুষিত নানা বিচিত্র সভ্যতা ও আচার বিচারের মহারণ্য এই ভারতবর্ষে ঐক্যের মহামিলন রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহা ঐতিহাসিক সত্য, কবি-কল্পনা নহে। যাহা একদা ছিল অতীত ভারতের মহাশক্তির উৎস, তাহা ভাবী ভারতেরও মহাশক্তির উৎস হইবে। এই বিশ্বাস তোমরা সর্ব্বদা অন্তরে পোষণ করিও।

ব্রাহ্মণের লক্ষণ জগৎ-কল্যাণ। ব্রহ্মগায়ত্রীর সাধক কখনই জগতের মঙ্গল-চিন্তা করিতে বিস্মৃত হইবে না। ব্রহ্মগায়ত্রী জপের অব্যবহিত পরেই, সে যে প্রকৃতই ব্রাহ্মণ, তাহার প্রমাণ ও পরিচয়-স্বরূপে তাহাকে কিছুকাল "ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং ভবামি, আমি জগতের মঙ্গলকারী হইতেছি", এই সঙ্কল্প করিতে হইবে। প্রতিদিনকার উপাসনায় জগন্মঙ্গলের এই মহৎ সঙ্কল্পকে একেবারে বাধ্যকর করিয়া লইতে হইবে। প্রতিদিন প্রাতে, দুপুরে, সন্ধ্যায় ও শয়নকালে চারিবার উপাসনা করিতে বসিয়া তাহারই মধ্যে নিয়মিত ভাবে জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প এইভাবে করিয়া যাইতে থাকিলে কিছুদিন পরে দেহ ও মন এমনই একটা আশ্চর্য্য গঠন নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে পাইয়া যাইবে, যাহাতে বিনা চেষ্টায় আপনা আপনিই তোমাদ্বারা নানাবিধ জগৎকল্যাণ হইতে থাকিবে। জগৎ-কল্যাণ-সঙ্কল্পকে সর্ব্বদা

জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প

বিশেষ কৌলীন্য দিবে। মানুষ কেবল নিজের স্বার্থে ভগবান্‌কে ডাকে বলিয়াই ওঙ্কার-মন্ত্রে তাহাদের অধিকার খর্ব্বিত হইয়াছে। জগতের কল্যাণে যে ভগবান্‌কে ডাকে, জগতের কল্যাণে যে জীবন ধারণ করে, সে-ই প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং তাহার জন্ম যেই কুলেই হইয়া থাকুক না কেন, ওঙ্কার-মন্ত্রে তাহারই আছে অধিকার।

লেঙ্গট বা কৌপীন প্রত্যেকেই ব্যবহার করিবে। কৌপীন পরিধানকালে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিবে যে, কিছুতেই তুমি তোমার ব্রত হইতে স্খলিত হইবে না, কোনও

কৌপীন

ক্রমেই মনের মধ্যে অসঙ্গত আকাঙ্ক্ষাকে জাগিতে দিবে না, কোন সময়েই ক্ষণিক সুখলাভের দাস হইয়া নিজ মনুষ্যত্বকে পথের ধুলিতে লুটাইয়া দিবে না। এইরূপ সঙ্কল্প করিবে যে, যত বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্য দিয়াই তোমাকে চলিতে হউক না কেন, তোমার ব্রহ্মচর্য্য তোমাকে বজায় রাখিতেই হইবে।

কৌপীন পরিধানের ফলে কাহারও কাহারও দদ্রুরোগ জন্মে। সুতরাং এই বিষয়ে সাবধান থাকিতে হইবে। দদ্রু চুলকণা প্রভৃতি যাহাতে শরীরের গুপ্ত স্থানসমূহে কিছুতেই না জন্মিতে পারে, তজ্জন্য সর্ব্বদা পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকিবে। কার্ব্বলিক সাবান ও দদ্রুনাশক ঔষধাদি ব্যবহার

দদ্রু

করিবে। প্রতিদিনই স্নানের পূর্ব্বে গুপ্ত

স্থানসমূহে সর্ষপ তৈল মাখা হিতকর। কখনও ময়লা কৌপীন ব্যবহার করিবে না।

ইচ্ছাপূর্ব্বক বীর্য্যক্ষয় কদাপি করিবে না। শত প্রকার নিয়ম পালন করিয়াও যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক বীর্য্যক্ষয় কর, তাহা হইলে নিয়ম পালনের সুফল ব্যর্থতায় ভাসিয়া যাইবে।

ইচ্ছাকৃত বীর্য্যক্ষয়

বীর্য্যক্ষয়ের প্রলোভন দমন করিবার জন্য দিবা রাত্রি মনে মনে সঙ্কল্পকে কেবল দৃঢ়তর করিতে থাক। আজ তুমি নিতান্তই অক্ষম ও ইন্দ্রিয়ের দাস থাকিতে পার কিন্তু জানিও, অধ্যবসায়-প্রভাবে নিশ্চয়ই তুমি জিতেন্দ্রিয় হইতে পারিবে। যাঁহার অপার দয়ায় জগাই মাধাই উদ্ধার হয়, সেই পরম কৃপাল পরমেশ্বর তোমাকেও উদ্ধার করিবেন। শুধু চাই বিশ্বাস এবং একাগ্র চেষ্টা। আরম্ভকালে সকল কাজই শক্ত বলিয়া মনে হয়, ইন্দ্রিয়-দমনও তোমার পক্ষে প্রথমে শক্ত মনে হইবে। কিন্তু সাধনের বলে তুমি অনায়াসে বিশ্ববরেণ্য দিগ্বিজয়ী মহাবীরে পরিণত হইতে পারিবে। প্রথমেই ভয় পাইয়া যাইও না। এ জগতে তোমারও অনেক কিছু করিবার রহিয়াছে এবং জানিও, সাধনাই তোমাকে সিদ্ধিদান করিবে। নিজেকে দুর্ব্বল ভাবিয়া, অকর্ম্মণ্য ভাবিয়া পথপাশে পড়িয়া বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া কাঁদিয়া মরিও না। সাহসে বুক বাঁধিয়া কাজ আরম্ভ কর। জগতের বিগত ও আগত সকল মহাপুরুষেরা প্রচ্ছন্ন ও প্রত্যক্ষ ভাবে তোমাকে একযোগে চতুর্দ্দিক হইতে সাহায্য দান করিতে থাকিবেন।

দুর্ব্বলতার সহিত আপোষ করিবে না। নিজের দুর্ব্বলতাকে একটা গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা কখনও করিও না। অপরের দুর্ব্বলতা নিয়া আলোচনায় কখনও মত্ত হইও না। অনুরোধ-উপরোধে পড়িয়া কখনও বিবেকবিরুদ্ধ উপসংহার কাজে রত হইও না। নিজের কাছে নিজে ছোট হইও না। সৎপথাশ্রয়ী ব্যক্তিকে অপরের চোখে খাটো করিবার চেষ্টা কখনও করিও না। সরল, শক্তিমান্, বীর্য্যবান্ আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিদের চরিত্রেরও দুর্ব্বল অংশগুলির অনুকরণে বিরত রহিবে। তুমি যে মহৎ-কিছু করিবার জন্যই জগতে নরদেহে আবির্ভূত হইয়াছ, এই বিশ্বাস হইতে প্রাণান্তেও কণামাত্র স্খলিত হইবে না। জানিবে, মনুষ্যজন্ম তুমি বৃথাই পাও নাই। এই জন্মকে শ্রেষ্ঠতম কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া সার্থক করিতে হইবে। এই জন্মকে সর্ব্বজন-শুভকর কার্য্যে বিনিয়োগ করিয়া সফল করিতে হইবে। হেলায় খেলায় জীবন তুমি কাটাইয়া দিতে পার না। ভয়কে তুমি মনের কোণেও থাকিতে দিও না।

অন্তর হইতে ভয়কে সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বাসিত কর। জীবনে তুমি কৃতকৃত্যতা অর্জ্জন করিবেই, মানুষের মত মানুষ হইয়া জগদ্‌বাসীর সমক্ষে উন্নতশিরে তুমি বিচরণ করিবেই, এই জিদ্‌কে, এই সঙ্কল্পকে দৃঢ় কর। দ্বিধা, কুণ্ঠা গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দাও।

(সমাপ্ত)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত গ্রন্থাবলী।

১। সরল ব্রহ্মচর্য্য ২·০০
২। অসংযমের মূলোচ্ছেদ ১.৫০
৩। জীবনের প্রথম প্রভাত ১.০০
৪। আদর্শ ছাত্র-জীবন ২.০০
৫। আত্ম-গঠন ৪.৫০
৬। সংযম-সাধনা ৪.৫০
৭। দিনলিপি ২.০০
৮। স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব ২.০০
৯। প্রবুদ্ধ যৌবন ২.৫০
১০। কুমারীর পবিত্রতা (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড) প্রতিটি ২·০০
১১। নবযুগের নারী ৩৫০
১২। গুরু ১৫·০০
১৩। অখণ্ড সংহিতা (১ম হইতে ২৪ খণ্ড) প্রতিটির মূল্য ১০.০০
১৪। মন্দির (গানের বই) ১০.০০
১৫। মূর্চ্ছনা ,, ১০·০০
১৬। মঙ্গল মুরলী ,, ৫.০০
১৭। মধুমল্লার ,, ৫.০০
১৮। সমবেত উপাসনা ৩.০০
১৯। নববর্ষের বাণী ৩.০০
২০। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য ১০.০০
২১। বিবাহিতের জীবন-সাধনা ৬.০০
২২। সধবার সংযম ১০.০০
২৩। বিধবার জীবন-যজ্ঞ ২.০০
২৪। কর্ম্মের পথে ৩.০০
২৫। কর্ম্মভেরী ১·৫০
২৬। আপনার জন ৩.০০
২৭। পথের সাথী ৫·০০
২৮। পথের সন্ধান ৩·৫০
২৯। পথের সঙ্কল্প ৩.৫০
৩০। সাধন-পথে ৩.৫০
৩১। ধৃতং প্রেম্না (১ম হইতে ৩৮শ খণ্ড) প্রতিটি ১·৫০
৩২। বন-পাহাড়ের চিঠি (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রতিটি ১.৫০
৩৩। শান্তির বারতা (১ম হইতে ৩য় খণ্ড) প্রতিটি ১.৫০
৩৪। সর্পাঘাতের চিকিৎসা ১.০০
৩৫। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ৩.০০
৩৬। সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ ৩·০০
৩৭। His Holy Words 1.00

হিন্দী অনুবাদ ঃ— ১। কর্ম্মের পথে ২.০০ ২। সংযম-সাধনা ২.৫০ ৩। আত্মগঠন ২.৫০ ৪। কুমারীর পবিত্রতা ২·০০ ৫। সরল ব্রহ্মচর্য্য ২.০০ ৬। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ২.০০

অর্ডারের সহিত সর্ব্বদা অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে ডাকব্যয় ভিঃ পিঃ করা হয়।